শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৩৬৭
প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯
মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬
প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্ণেন্দু চাকী

এগুলো প্রেমের গল্প। তবে সবগুলো নয়। সবগুলো নয়, তাই বা বলি কী করে? প্রেমের গল্পকে অত সঠিক ভাবে চেনানোর কোনও উপায় নেই আমার। এদের অনেক কিছুই আমার টুকরো টুকরো স্মৃতি থেকে তোলা। এই গল্পগুলো লিখতে গিয়ে একটা ধারণা আমার পরিষ্কার হয়েছে; তা হল যে কল্পনা থেকে যে বিশেষ ধরণের গল্প লেখা খুব কঠিন—অন্তত আমার পক্ষে—তা হল প্রেমের গল্প। তা বলে সব প্রেমই যে নিজের জীবন থেকে আসে তা তো নয়, অধিকাংশই আসে আশপাশের অভিজ্ঞতা থেকে। আমি সেই সব স্মৃতি সযত্নে জমাচ্ছিলাম এতকাল। হঠাৎ একদিন লিখতে লাগলুম।

প্রেমের গল্প লেখাটা মোটেই সহজ না, আর আমার প্রথম প্রথম একটু কুণ্ঠাও ছিল। 'বয় মিটস গার্ল' জাতের প্রেমের গল্প কোনোদিন লিখব না ঠিক করেছিলাম, লিখিওনি। এ গল্পগুলোও সে ধাঁচের নয়। এরা একটু অদ্ভুত ধরণের, স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে পিটিয়ে থাকা ব্যথা বেদনার দৃশ্য সব। এদের কিছু কিছুর পটভূমি আমার শৈশবের পাড়া, কিছু কিছুর বিদেশের এখানে-ওখানে। মানুষ ছাড়াও এই সব গল্পের প্রেম আছে কিছু কিছু স্থান ও কালের সঙ্গে মিশে।

এবং গানের সঙ্গে। যে কারণে কয়েকটি গল্পের বিষয় ও নামকরণে গান আছে। বইয়ের নামকরণেও তা-ই ধরে রেখেছি।

আর প্রেম আছে এই গল্পগুলির প্রতি কিছু মানুষের অনুরাগ ও দুর্বলতায়। যাঁদের মধ্যে আছে আমার স্ত্রী (সারা জীবন ধরে শুধু প্রেমের গল্প লিখলেই যে সব চেয়ে বেশি খুশি হতো), আছেন গায়ক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং……না, থাক। এ লিস্টি আমার পেশ করার দায়িত্ব নয়।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হতো না যদি শুধু প্রেমের গল্প দিয়ে এই সঙ্কলন করার পরামর্শ ও উদ্যোগ না আসত সহদেব সাহার কাছ থেকে। আমার গল্পগুলোকে ভালবেসে ও আমাকে রীতিমতো বিচলিত করেছে। এরকম এক অনুরাগীর জন্য আমি আরও প্রেমের গল্প লিখতে চাইব পরে।

প্রচ্ছদ এঁকে ওঁর ভালবাসা ব্যক্ত করেছেন শিল্পী কৃষ্ণেন্দু চাকী। সেই সব ভালবাসাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মূর্খ সাজতে চাই না। সব শেষে বলি, এই বই আমার খুব প্রিয় বই। কোনও কারচুপি নেই কোথাও, পাঠকের ভালবাসা পেলে……না, হ্যাংলামি করব না।

মডার্ন কলাম প্রকাশিত এই লেখকের

হার হাইনেস

প্রিয়, শ্রদ্ধেয়
পণ্ডিত রবিশংকরকে

আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি

আমি রবাবরের সেই ল্যাবেণ্ডিস মার্কা রাজুই থেকে গেলাম। নিচে পার্টির সব অভ্যাগতই এসে গেল, আমার এখনও টাই বাছা হল না। সাদার ওপর নীল পিনস্ট্রাইপ শার্টের ওপর নীল ব্লেজারটা চাপালেই মেরুনের ওপর স্কাই ব্লু পোল্‌কা ডটের ওই টাইটা উঠে আসবেই গলে। এভাবেই চলে আসছে গত সাত দিন; ভেবেছিলাম আজ নতুন একটা টাই বেছে ফেলবই।

আর এখন আমি আধ ডজন টাই নিয়ে গলায় ঘোরাচ্ছি। আর এইমাত্র—

'রাজুকাকু! প্লিজ গেট রেডি। সব্বাই এসে গেছে। উই আর অল ওয়েটিং ফর ইউ।'

দরজায় টোকা মেরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে আমায় সোমা। ভাবছে অত না চেঁচালে আমার ঘুম ভাঙবে না। মেয়েটার ধারণা আমি দোর দিলেই কম্বলের নিচে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ি। ওর ভাষায়—কাকুর লণ্ডন ঘুম!

আর আমি আধ ডজন টাই হাতে আলমারির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। আমি কোনদিন মানুষ হবো না।

এক মাসও হয়নি আমার নির্মলদা'র বাড়িতে, কিন্তু কারওই আর জানতে বাকি নেই আমি কী অসম্ভব স্নান, নিদ্রা আর আত্ম-বিলাসী। যদি বাথটাবে সাবান জমিয়ে স্নানে নামলাম তো ঘড়ি স্থির হয়ে গেল। যদি ঘুম লাগালাম তো নাওয়াখাওয়া চুলোয় গেল। আর যদি এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে জানালার পাশে বসলাম তো আমার থেকে 'আমি'টাই উধাও হল। আমি একটা রক্তমাংসের স্ট্যাচু হয়ে গেলাম। তখন কবার সোমা নিচের থেকে হাঁক দিল, নির্মলদা দোতলার টয়লেট ব্যবহার করতে এসে মৃদু-

কণ্ঠে কবার ডাকলেন 'রাজু! রাজু!' আমার খেয়াল থাকে না। কিন্তু এই বিশ্বকুঁড়েমির সঙ্গে এক বিশ্বকপালও আমার জুটেছে। সবাই আড়াই দিনের মাথায় আমার ভাবগতিক বুঝে নিয়ে তৃতীয় দিন থেকে আমার সাত খুন মাফ করতে থাকে। সোমা আর ওর বাবাও আমাকে প্রশ্রয়ের সুরে ইদানীং ডাকে ফিলোসফার বলে। ওদের ধারণা আমি সম্ভবত ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ভাবি।

সত্যিই যদি ওরা দেখতে পেত আমার ভিতরটা। আমি যখন স্নানে কিংবা নিজের মধ্যেই ডুবে থাকি তখন আসলে আমি কিছুই ভাবি না। শুধু একটা স্বপ্ন স্বপ্ন ভাব ছেয়ে থাকে আমার চোখে, যা আমি আনমনে দেখি। আবার দেখিও না। কিন্তু ভীষণ সুখ অনুভব করি। বাবার কথা মনে পড়ে, যিনি থেকে থেকেই বলতেন, রাজুকে আমি অক্সফোর্ডে পড়াব। কিন্তু হঠাৎ একদিন মামলার ফাইল দেখতে দেখতে সেরেব্রাল স্ট্রোক হল বাবার। ফলে কথা রাখা হয়নি। লণ্ডনে এসে অজস্র সুখের মধ্যে একটা সুখ হল মনশ্চক্ষে বাবার সেই মুখটা দেখতে পাওয়া। একেক দিন গলায় টাই বাঁধতে বাঁধতে আমি আপন মনে হেসে ফেলি। কারণ আয়নায় তখন আমি আমার মুখের জায়গায় দেখতে পাই বাবার মুখ। কোর্টে যাওয়ার আগে তাড়িঘড়ি টাইয়ের নট ফাঁসাতে গিয়ে লেংথ মিস করছেন!

সোমার ডাক শুনে আমার চকিতে মনে পড়ল অপিসের বন্ধু রাণাকে। ও-ই চিঠি লিখে আমার থাকার বন্দোবস্ত করেছিল লণ্ডনে। বলেছিল, থাকবি তো চার মাস। অযথা পাউণ্ড নষ্ট করবি কেন? দাদাকে লিখে দিচ্ছি—তোর বোর্ড অ্যাণ্ড লজিং ফ্রি। পকেটে যা থাকে নিজের কাজে খরচ কর। দাদাকে একটা পেনিও দেবার দরকার নেই।

একই সঙ্গে আশ্বস্ত এবং বিব্রত হয়ে বলেছিলাম, সে কী বলছ! অতদিন থাকব, একটা পয়সাও দেব না সংসারে?

রাণা বলল, এগ্‌জ্যাক্টলি! দাদার ওখানে ওটাই নিয়ম। আর দাদার সংসার বলতে তো দাদা আর সোমা। বৌদি শিলঙে থাকেন, কলেজ অধ্যাপিকা। ছুটিছাটায় লণ্ডন যান। দেখবি

সোমাই তোর দেখাশোনা করবে। শি ইজ এ জেম অফ এ গার্ল !
সোমাই ডেকে উঠল ফের, কাকু ! আর আমি এই প্রথম ওর ডাকে উত্তর করলাম, যাচ্ছি ! আই'ম রেডি ! রীতিমতো বিব্রত হয়ে আমি ওই মেরুন জমিতে নীল পোল্‌কা ডটের টাইটা চড়িয়ে লম্বা লম্বা স্টেপিঙে নেমে এলাম একতলার বসার ঘরে।
কোনও অর্থেই কোনদিন আমি পার্টি ম্যান নই। পার্টিতে লাগসই কথোপকথন আমার আসে না, ঘুরে ঘুরে বারোজনের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারি না, কাকে কোন পার্টিতে আগে দেখেছিলাম মনে করতে পারি না। আরও বড় সমস্যা, হাতে খাবারের প্লেট নিয়ে একই সঙ্গে খাওয়া আর বাতচিৎ চালিয়ে যেতে পারি না। প্রায়ই দেখি আমি যখন খাবার তুলেছি হাতে তখন একে একে লোকজন আলাপে প্রবৃত্ত হচ্ছেন আমার সঙ্গে। শেষে আধপেটা খেয়ে নিজেকে দুষতে দুষতে বাড়ি ফিরি। কিন্তু আজ আমি পেট পুরে খাব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, কারণ দেড় দিন ধরে স্কুলের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে পদগুলো তৈরি করেছে সোমা ! আর সুযোগ বুঝে একবারটি শুনিয়েও রেখেছে, কাকু, ল্যাম্ব রোস্টটা কিন্তু তোমার জন্য স্পেশ্যালি মেড। আই মাস্ট হ্যাভ ইয়োর ওপিনিয়ন।
আর আমি এখন সেই পার্টির মাঝখানে।
নির্মলদা লণ্ডনের এক পাবলিক স্কুলের শিক্ষক বলে ও'র অভ্যাগতদের অধিকাংশই শিক্ষক-শিক্ষিকা। যাঁদের অধিকাংশই আবার সাহেব-মেম। শিক্ষক বললেই আমাদের দেশে কিছু ভারিক্কি চেহারার বয়স্ক লোকের চেহারা মনে পড়ে। নির্মলদার সহকর্মীরা দেখলাম দারুণ হাসিখুশি, টগবগে তরুণ-তরুণী। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসী নির্মলদাকে যাঁরা 'পাপা', 'ওল্ড ম্যান', 'গ্র্যাণ্ডপা' বলে ডাকছেন। ঠাট্টা করেই, কিন্তু নির্মলদা'র কাছে ডাকগুলো ভীষণ অমায়িক ঠেকছে। নির্মলদার 'স্বভাবগম্ভীর আচার-ব্যবহারও দেখি বিলকুল বদলে গেছে ওঁদের সঙ্গে পড়ে। উনি ওঁদের কাছে আমাকে পরিচয় করালেন ভাইয়ের বন্ধু বলে নয়, 'জাস্ট অ্যাবাউট মাই ইয়ঙ্গার ব্রাদার' হিসেবে। বলতে বলতে

হাতে ধরিয়ে দিলেন বিয়ারের একটা জাগ। তারপর নিয়ে এলেন ও'র বাঙালি বন্ধুদের কাছে। চার-চারটি বিভিন্নবয়সী বাঙালি দম্পতি। চতুর্থ দম্পতি বয়সে সব চেয়ে ছোট, নির্মলদা জানালেন স্বামীটি ম্যাকেলসফিল্ড হসপিটালের সার্জেন। স্ত্রী পার্ট টাইম কাজ করে পোস্ট অফিসে। নাম বৃন্দা। আর…

আর কিছুই আমার মগজে ঢুকছে না। আমি ক্ষণিকের জন্য অসম্ভব অবাক হয়ে তাকালাম মেয়েটির দিকে। রূপে জ্বলে যাচ্ছে সারা দেহ। যেমন রূপ শুধু ছবিতেই দেখি আমরা। আর দেখলেই মনে হয়, আহা, কত চেনা মুখ! কী যেন নাম? আসলে চেনা নয় কোনখানেই, তবু মনে হয়। আর সব মনে হওয়াটাই বিদ্যুতের এক ঝলকের মতো। কিন্তু তারই মধ্যেই বিষণ্ণ হয়ে পড়ে মনটা। আগে কোনদিন না-দেখার অনুশোচনায়, পরেও হয়তো দেখা না হওয়ার সম্ভাবনায়।

নির্মলদা আমার পরিচয় দিতে গিয়ে কী-সব বলছেন আমি শুনতে পাচ্ছি না। শুধু হাসি-হাসি মুখ করে ফ্যালফ্যাল করে দেখছি বৃন্দাকে। আর দেখছি বৃন্দাও আমাকে দেখছে! আর হঠাৎ কীরকম লজ্জা হল আমার। আমি বিয়ারের ঢোক গিলতে গিলতে সরে এলাম পার্টির অন্যত্র।

একটি ইংরেজ যুবতী সবার নজর কেড়ে নিয়েছে। সে তার স্কুলের ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক ইত্যাদির শিক্ষকদের গলা আর হাবভাব অনুকরণ করে দেখাচ্ছে। সেই সব শিক্ষকদের প্রশ্নের জবাবে বালক-বালিকারা যেভাবে কোঁকায় সেই স্বরও 'উঁই উঁই, কুঁই কুঁই' করে শোনাচ্ছে। ওর আশপাশের সবাই হেসে কুটোপুটি যাচ্ছে, তাদের দেখাদেখি আমিও খুব হাসছি। আমার খুব ভাল লাগছে এই ভেবে যে কলকাতার পার্টিগুলোতে যেরকম আজেবাজে কথা হয়, অনুপস্থিত লোকের নিন্দে হয় আর একটা-দুটো লোক বেরোয় যারা জীবনের সমস্ত কান্নাকাটি লোকজনের সামনে সেরে ফেলবে বলে তৈরি হয়ে আছে তেমন কিছুর সম্ভাবনা এখানে নেই। ভাল লাগছে এটা দেখেও যে কেউ কাউকে জোর করে বেশি বিয়ার, হুইস্কি বা ওয়াইন গিলিয়ে দিচ্ছে না। আর ভীষণ

ভাল লাগছে শুনতে কিছু বিশুদ্ধ অক্সফোর্ড-ইংরেজি অ্যাকসেণ্ট। ক্রমে এই সব বিক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত ভাল লাগাগুলোকেও ভাল লাগতে শুরু করেছে আমার। আমার মতো লোকের ভেতরে যে-ধরনের বিলাতবিলাসিতা লুকিয়ে থাকে সেটাই যেন দাবী মদের মতো আস্তে আস্তে অধিকার করছে আমাকে। বৃন্দার মুখটা ভুলতে যতটা কষ্ট হবে ভেবেছিলাম তেমন কষ্ট কিছু হচ্ছে না। তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বিয়ার হাতে আমি নিজেকেই ভুলতে বসেছি।

'আপনাদের দেশে তো খুব ময়ূর হয়। আপনি স্বপ্নে কখনও ময়ূর দেখেছেন?'—আমি চমকে উঠে পাশে তাকিয়ে দেখলাম প্রশ্নটা করেছে বারবারা নামের মেয়েটি। কিছুক্ষণ আগে নির্মলদা যার সঙ্গে পরিচয় করাতে গিয়ে বলেছিলেন, জানো তো, বারবারা ড্রইং টিচার হলে কী হবে, ওর আসল প্যাশন কিন্তু সাইকোলজি। মনোবিজ্ঞানের ওপর একটা থিসিস নিয়েও ও কাজ করছে।

আমি বারবারার কথায় কীরকম বোকার মতো হয়ে গেলাম। ময়ূর! ময়ূর দেখিনি যে তা নয়। তবে স্বপ্নে? আমি এক ঢোকে জাগের বাকি বিয়ারটুকু শেষ করে দিয়ে একটু বা আমতা আমতা করে বললাম, ময়ূর খুব সুন্দর ঠিকই, কিন্তু আমার প্রিয় পাখি কিছু নয়। ছেলেবেলায় দেখেছি কি না মনে নেই, এখন অন্তত স্বপ্নে ময়ূর, বক বা হাঁসটাস দেখি না।

তুমি কি স্বপ্নে কোকিলের ডাক শুনেছ?

কোকিল তো এখানকার খুব ডাকসাইটে পাখি।

বারবারা হা হা হি হি করে হাসতে শুরু করল।

হাসতে লাগলাম আমিও। আর কোত্থেকে উঠে এসে নির্মলদা মেয়েটিকে বললেন, রাজু কিছু বাজে কথা বলে ফেলল বুঝি?

বারবারা বলল, হ্যাঁ। ও বলতে চায় ও স্বপ্নে পাখি দেখে না। আমার ধারণা ও সাপ দেখে। কথাটা বলেই খুব গম্ভীর করে ফেলল মুখটা। যেন শেষের কথাটা মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতেই বলেছে। যা দেখে ভেতরে ভেতরে হোঁচট খেলাম আমি। কারণ আমি তো সত্যিই বিরাট-বিরাট সবুজ-সবুজ ময়াল সাপ দেখি স্বপ্নে। কী যে তার মানে তা কেবল ফ্রয়েড সাহেবই জানেন।

নির্মলদা বারবারার কথার সংশোধন করে বললেন, দূর! রাজু কেবল বড় বড় স্বপ্ন দেখে। ও সাপখোপ দেখবে কেন? ও কুমির দেখে!

আমরা ফের জোরে জোরে হাসতে লাগলাম। আর তখনই বসার ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কেতাদুরস্ত উচ্চারণ আর মধুঝরা সুরে সোমা ঘোষণা করল, ডিনার ইজ সার্ভড। শ্যাল উই মুভ টু দ্য ডাইনিং প্লেস? নির্মলদার স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস শার্লি পাইন্টার ছুটে গিয়ে সোমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, ও! হোয়াট আ ফাইন পিস অফ ইনফর্মেশন। সাউন্ডস লাইক মিউজিক!

আমি এইমাত্র প্লেটে উঠিয়ে নিলাম আরেক পিস ল্যাম্ব রোস্ট। উঃ কী ভীষণ ভাল রেঁধেছে পদটা সোমা। মেয়েটা সত্যিই একটা জিনিয়াস। তের-চোদ্দ বছরের একরত্তি মেয়ের মধ্যে অবলীলায় মিশে আছে একটা মা, একটা মেয়ে, একটা বোন। যেমন বাবাকে তেমনি এই উড়ে এসে জুড়ে বসা কাকুটিকে খাইয়ে পরিয়ে যত্ন-আত্তিতে জিইয়ে রেখেছে। এ ক'দিনের মধ্যেই ওর বাবার দশা আমারও। সোমা না থাকলে চোখে অন্ধকার দেখি। শুনছি ক'দিন বাদে স্কুলের এক্সকার্শনে স্কটল্যান্ড যাবে। তখন যে কী হাল হবে আমাদের এক ভগাই জানে। আমি ল্যাম্বের দ্বিতীয় টুকরোটা ছুরি-কাঁটায় ছিঁড়তে ছিঁড়তে ইতিউতি তাকালাম সোমাকে ডাকব বলে। সাঙ্ঘাতিক একটা প্রশংসা ওর প্রাপ্য। কিন্তু কোথায় সোমা? লোকের ভিড়ে মিডনাইট ব্লু গাউন পরা মেয়েটিকে তো কোথাও দেখছি না। নিশ্চয়ই ডেসার্ট প্লেটগুলো রেডি করতে গেছে। মেয়েটার মাথার মধ্যে একটা রোলেক্স কি ওমেগা ঘড়ি গাঁথা আছে নিশ্চয়ই। আমি একটা ল্যাম্ব টুকরো পুরলাম মুখে।

লন্ডনের বাঙালি ও ইংরেজ পরিবারে দুটো-একটা ডিনারে আমন্ত্রণ পেয়েছি এর মধ্যে। দেখেছি খাওয়ার শেষে অতিথিরা নিজের নিজের প্লেটগুলো সিঙ্কে নিয়ে ধুয়ে দেন। দেশের মতো এখানে তো আর কাজের লোক রাখার বিলাসিতা বিশেষ নেই। দিনে

ঘণ্টা দুয়েকের জন্য কাজের লোক রাখলে যে দক্ষিণা গুনতে হবে তাতে মনিবের কামাই ফুরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়। ফলে এসব ক্ষেত্রে সবখানেই দেখি আপনা হাত জগন্নাথ। এ বাড়িতে আমার আবির্ভাবের প্রথম দিনেই নির্মলদা যে-দু' চারটে ব্যবহারিক শিক্ষা আমায় দিয়েছিলেন তার একটা হল গরম আর ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে, প্লেটে গ্লাসে ওয়াশিং পাউডার ঢেলে নিজের বাসন ধুয়ে, ন্যাকড়ায় মুছে জায়গা মতো গুছিয়ে রাখা। অনেক দিন বাসন ধুতে ধুতে সিঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করেছি নির্মলদা কি সোমার সঙ্গে। নির্মলদা বলেন, সিঙ্কের পাশের এই জায়গাটা আমাদের উঠোন। এখানে দাঁড়ালে পরনিন্দা-পরচর্চা আপনা-আপনি আসে। আর আস্তে আস্তে এও দেখেছি যে এ-জায়গাটায় একলা দাঁড়িয়ে বাসন মাজার সময় আমার মনে পড়ে দেশের কথা। মায়ের কথা। মা কোনদিন অন্যকে দিয়ে নিজের বাসন ধোয়ায় না।

ক্রমে ক্রমে সবাই নিজের নিজের বাসন ধুয়ে, জায়গা মতো রেখে আইসক্রিম কেকের প্লেট নিয়ে ড্রইং রুমে চলে গেছে। পার্টিতে শেষ ঢুকেছিলাম আমি, ডিনারও সবার শেষে হাসিল করলাম আমি। তাই কিছুটা লজ্জার সঙ্গেই গুটি গুটি হাতের প্লেট আর কাঁটা-চামচ নিয়ে চলে এসেছি রান্নাঘরের এক প্রান্তে বসানো ডিশ ধোয়ার সিঙ্কে। লজ্জা আরেকটা কারণেও; এখনও কাঁটা-চামচে পরিপাটি করে খাওয়া রপ্ত করতে পারলাম না। চিকেনের পদটা প্রায় অনাস্বাদিতই থেকে গেল আমার হাতুড়ে মার্কা খাওয়ার পদ্ধতিতে। কাঁটা-চামচের খটখটাং আওয়াজ বার করি না ঠিকই, কিন্তু সামান্য কুটকুট আওয়াজেও আহার সারতে পারি না। কাঁটা-চামচ ধরলেই স্যুট-বুটের ভেতর থেকে আমার ভেতো বাঙালি সত্তাটা এখনও উঁকি-ঝুঁকি দেয়। প্লেটে খাবারের অবশিষ্টাংশের স্তূপ দেখে জিভ কাটতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে......আমার চিঠির উত্তর পাইনি কিন্তু!

সুরেলা, মেয়েলি কণ্ঠে কে বলল এ কথা? চকিতে ঘুরে দেখি কিচেনের দরজায় একটা অভিমানী হাসি মেখে দাঁড়িয়ে আছে বৃন্দা। চিঠি! কিসের চিঠি! কার চিঠি! কেন! আকাশ-

পাতাল ভেবেও কিনারা করতে পারছি না। আমতা আমতা করে বললাম, আমায় বললেন, বৃন্দা ?
বৃন্দা এক রতি অভিমানও ত্যাগ না করেই বলল, আবার কাকে ?
—কিন্তু…কিন্তু…আমি তো…
—বারো বছর হয়ে গেছে তো ! তাই মনে পড়ছে না।
বৃন্দা এবার ঠাট্টার হাসি হাসছে। আর আমি মনে করার চেষ্টা করছি বারো বছর আগে কোনও মেয়ের চিঠি…
বৃন্দা ফের বলল, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটা গান শোনার অনুরোধ করেছিলাম। আপনি খুব মানবেন্দ্র-ভক্ত ছিলেন, না ?
হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো ! তাই তো ! তাই তো। আমি ভুলিনি। আমার সব মনে আছে…আমার সব মনে থাকে…চিঠির ভাষা থেকে হাতের লেখা থেকে প্রেমিকার মুখ থেকে গানের বাণী থেকে গানের সুর থেকে চোখের জল থেকে…আবার কী করে, কী করে যেন সব ভুলেও যাই। যেমন ভুলেছিলাম বৃন্দাকে।
পাড়ার ডাকসাইটে কার্ডিওলজিস্টের কিশোরী কন্যা বৃন্দা। পটে আঁকা ছবি থেকে নামানো। শরীর পূর্ণ প্রস্ফুটিত নয়, কিন্তু কী রূপ ! আমি বোর্ডিং স্কুল থেকে ছুটিতে বাড়ি ফিরেছি হায়ার সেকেন্ডারি টেস্টের পড়া করব বলে। চাইলেও বোর্ডিঙেই থেকে যেতে পারতাম। কিন্তু বেশি বেশি পড়া করতে গেলে আমার বাড়ির ছাদের চিলেকোঠাটা খুব দরকার। দারুণ নিরিবিলি। আড় চোখে আকাশ আর ঘুড়ি দেখি। পড়তে পড়তে ক্লান্ত হলে ছাদ ঘুরে ঘুরে পায়রাদের দানা খাওয়াই। কাদের পায়রা এরা জানি না। কিন্তু দানা ধরলে হাতে এসে বসে। আমি তখন দার্শনিকের মতো ইন্ডাক্টিভ লজিকের সিলোজিজম কষি মনে মনে। সব প্রাণীই মরণশীল ; সব মানুষই প্রাণী ; কাজেই সব মানুষই মরণশীল।
পড়তে পড়তে সন্ধে নামলে আমার আরেকটা বিনোদন আছে। চিলে কোঠার পিছনের জানালাটা খুলে দিয়ে স্থির হয়ে বসা মেছো বাড়ির পিছনে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে লোরেনদের বসার ঘর পরিষ্কার দেখি তখন। ঘরে গ্রাম চালিয়ে আপন মনে স্টেপিং প্র্যাক্টিস

করছে লোরেন। কখনো কখনো স্ট্রিপ টিজ অভ্যেস করছে। পুরো মাত্রায়! তখন আমি আমার ঘরের লাইট নিবিয়ে ও তুলোর মতো সাদা আর লাস্যে ভরা দেহটাকে চোখ ভরে দেখি। অদ্ভুত রোমাঞ্চ হয় শরীরে, যা আমার ভাল লাগে। মিশনের ছাত্র আমি, এই বুঝি স্খলন—ভাবি আমি। পরক্ষণেই ভাবি, এও তো জীবন। লোরেন যেমন এসব করে আমাকে বিব্রত করতে, আমি দেখি কারণ আমার বিব্রত হওয়ার চেয়ে ভাল লাগাটা বেশি। আমি নারী দেহ দেখছি। বিশেষ কাউকে দেখছি না। ওই দৃশ্য আর আমার ভাবনায় শরীর গরম হয়, ঘামি। কিন্তু আমি নিজেকে বলি—এ আমার পরীক্ষা। আমি পাশ করবই। তারপর এক সময় আমি ঘরের জানালা বন্ধ করে, লাইট জ্বালিয়ে লজিকের বই নিয়ে বসি।

কিন্তু সেদিন একতলায় পড়ছিলাম স্বর্গত পিতার বন্ধ সেরেস্তায়। সামনে খোলা সংস্কৃত বই। যখন ঘরে ঢুকে কাজের লোক বুড়িমা একটা ছোট্ট খাম দিল হাতে। বলল, ডাক্তারবাবুর মেয়ে বিন্দি দিয়েচে। বলেচে দাদাবাবুর কাচ থেকে উত্তর এনো।

আমি বুঝলাম না কে বিন্দি, কেন চিঠি লিখেছে, কী উত্তর চায়। আমি চিঠিটা নিয়ে বুড়িমাকে বললাম, ঠিক আছে। তুমি যাও। তারপর রাইটার্সের কেরানীর উন্নাসিক ঔদ্ধত্যে পড়পড় করে খাম ছিঁড়ে বার করে ফেললাম চিঠিটা। আর পড়তে গিয়ে···না, কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না ওই কিশোরী বৃন্দা আমাকে এই চিঠি লিখেছে। এমন এক চিঠি যার কোন উত্তর হয় না। অন্তত আমি জানি না। কিংবা, জানলেও নিজের মাথা খুইয়ে লিখে বসতে পারব না। বস্তুত, পড়তে পড়তেই আমি যেন কীরকম হয়ে যাচ্ছি। ও লিখছে—

প্রিয়—

শেষে চিঠি লিখিয়েই ছাড়লে। ছাদ থেকে কেন তাকিয়ে থাকো না আমাদের ছাদের দিকে? যাতে আমায় দেখতে পাও বা আমি তোমায় দেখতে পাই। খুব পা-ভারী লোক তুমি কিন্তু! সবাই তোমার খুব সুখ্যাতি করে। বলে তুমি খুব পণ্ডিত। খুব ভাল

ইংরিজি জানো। আমিও সুখ্যাতি করি। বলি, ও কোনও মেয়ের দিকে তাকায় না। খুব ভাল লাগত যদি বলতে পারতাম, শুধু আমার দিকে ছাড়া।
শুনেছি তুমি খুব গান শোনো, গান ভালবাসো। আমিও ভালবাসি। আমার বান্ধবীরা কেউ গান জানে না, আমি ছাড়া। কিন্তু আমি কখনও বাইরের লোকের সামনে গাই না। তুমি যদি এ চিঠির উত্তর দাও তাহলে আমি কোনও একদিন তোমায় একটা গান শোনাতে পারি। আসলে তোমার সঙ্গে খুব ভাব করতে ইচ্ছে করছে। তোমায় রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলে খুব ভাল লাগে। ইচ্ছে হয় ডাকি, তারপর বুক ধড়ফড় করতে থাকে। জানি না তো তুমি কী রকম মানুষ। নিশ্চয়ই খুব গম্ভীর। কিন্তু রাগী নও। আমি সেধে আলাপ করলে হয়তো পাত্তাই দেবে না। সেদিন যখন চঞ্চলার মুখে শুনলাম তুমি সপ্তাহ খানেক পর বোর্ডিং-এ ফিরে যাবে তখন বাধ্য হয়ে চিঠি লিখে ফেললাম।
কে যেন বলছিল যে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি' গানটা তোমার সব চেয়ে প্রিয় বাংলা আধুনিক। শোনা অবধি কীরকম যে করছে বুকের ভেতরটা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। ওই গানটা জীবনে সব চেয়ে ভাল লেগেছে। শুনলে কীরকম যে হয়! আর ওই গানটাই তোমার এত প্রিয় জেনে আর থাকতে পারলাম না। রোজ দুবার করে গ্রামোফোনে শুনছি আর ভাবছি, ইস! থাকত যদি ও এখানটায়! খুব বেহায়া ভাবছ নিশ্চয়ই আমাকে। যা আমি মোটেই নই। ছেলেদের ভালবেসে ফেলা যে কী তা কোনদিন জানতাম না। আর নতুন করে জানতেও চাই না। একবারই ঘাট হয়েছে আমার।
যদি চিঠির উত্তর দাও তোমাদের বুড়িমার হাতে পাঠিও। আর যদি না দাও আমি···না, আমি তোমাকে কিছু বলব না।

ইতি

তোমার বৃন্দা

মূর্খ, পাষণ্ড আমি। আমি চিঠিটা পড়লাম। একবার দুবার তিনবার চারবার পাঁচবার বহুবার পড়লাম। বহুবার কলম তুলেও

রেখে দিলাম। এ আমি কী করতে যাচ্ছি! সামনে পরীক্ষা, আর আমি প্রেমপত্র লিখতে বসব! তাও এমন কাউকে যে না-চিনে, না-জেনে এরকম চিঠি লিখে ফেলে! যে এত খোঁজ নিয়েছে আমার শুধু প্রেম করবে বলে। পাড়ায় ঢিঢি পড়ে যাবে না? লোকে কী বলবে? বলবে, ওপরে সাধু সাধু, পণ্ডিত-পন্ডিত। তলে তলে···না, এ আমি বরদাস্ত করতে পারব না। আমার সব প্রেম চাপা থাক সত্তার গভীরে, আর ওপরে আমি থাকি আমার মতোই। এ চিঠির উত্তর দেওয়া মানেই প্রেমে পড়া। যা আমি কিছুতেই পড়ব না।

আমি চিঠিটা দলা পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দুদ্দাড় করে উঠে গেলাম চিলেকোঠার ঘরে। গিয়ে জানালা খুলে বসলাম। আর দেখি স্ট্রিপ টিজে মত্ত আছে লোরেন। মনে মনে বললাম বাঁচিয়েছে! দূর থেকে এ অনেক ভাল। আমি কারও কাছে কিছুতেই যাব না। ভাবতে ভাবতে দু চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল পড়ল। লোরেনের ঘরের গ্র্যাম থেকে এলভিসের রক-এন-রোল গান ভেসে আসছে। কিন্তু আমি শুনছি মনের ভেতরে মানবেন্দ্র গাইছে 'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি'।

ক'দিন বাদে চলে গেলাম বোর্ডিং-এ। চিঠি না লিখে। পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরে এসেও কাউকে চিঠি লিখলাম না। কলেজে যাবার পথেও তাকালাম না একটা বিশেষ বাড়ির দিকে। বুঝলাম আমি ঘোরতর ভাবে প্রেমে পড়েছি এমন একটা মেয়ের সঙ্গে যে এমন একটা গান ভালবাসে যা শুনলে আমার খুব অভিমান আর অহংকার হয়। রোজ ভাবি, আর একটা চিঠি যদি আসে···যা আসে না। রাগে আমি আরওই একা হয়ে যাই। নিজেকে বোঝাই যে আমার প্রেমকে নিজে হেঁটে আসতে হবে আমার কাছে। আমি কোথাও যাই না। আমার বুকে এত প্রেম আছে যে আমার পক্ষে কাউকে প্রেম নিবেদন সাজে না। আমি অপেক্ষা করতে করতে ভুলে যাই কিসের অপেক্ষায় ছিলাম। আমি নিজের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাই।

যখন ঘোর কাটল দেখি খুব বিব্রত, আরক্ত মুখে বৃন্দা তখনও

আমার উত্তরের অপেক্ষায়। বললাম, কেন তুমি আরেকটা চিঠি লিখলে না, বৃন্দা ? প্রথম চিঠিতে অনেকেই তো ভুল করে। শুধু আরেকটা চিঠি যদি···

বৃন্দা মাথা নীচু করে দাঁড়াল একটু। কী ভাবল। তারপর মাথা তুলে ভীষণ দুর্বল, কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, তাতে কী লিখতাম ?

—শুধু একটা গানের লাইন।

বৃন্দা অপ্রস্তুত হয়ে ছুটে চলে গেল। আর ততক্ষণে ওর বিব্রত অবস্থাটা চালান এলো আমার মধ্যে। হাতের ডিনার প্লেটটা মুছতে গিয়ে ছিটকে ফেললাম মাটিতে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তিনটে ভাঙা টুকরো কুড়োতে যাচ্ছি যখন একটা দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকল সোমা—এ কী ! কী করছ কাকু ! লিভ ইট ! লিভ ইট ! আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

ব্যাজার মুখে বললাম, দেখো তো, কী একটা নিউসেন্স ঘটিয়ে বসলাম !

সোমা প্রতিবাদ করল, না, না, দিস ইজ গুড ফর আ পার্টি। পার্টিতে কিছু একটা না ভাঙলে পার্টি কমপ্লিট হয় না।

আমি বললাম, সব ভাঙার দায়িত্ব শুধু কি আমারই, সোমা ?

ভাঙা টুকরোগুলো বিন্‌-এ চালতে চালতে ডেঁপো মেয়ের মতো সোমা বলল, যারা মন ভাঙে তাদের এটা অভ্যেস হয়ে যায়।

সর্বনাশ ! মেয়েটা কখন কী শুনল ? এত অনুমান শক্তি ওর কোত্থেকে এল ? ও কি তলে তলে এত পাকা নাকি ? আমি ভাল করে চোদ্দ বছরের মেয়েটার দিকে তাকালাম। খুব সুন্দর, মড চেহারা। কোথাও কোনও মিল নেই সেই হারানো কিশোরী বৃন্দার সঙ্গে। আবার কোথায় যেন ওরা একেবারে এক।

সোমা ফের বলল, কাকু, তুমি ড্রইং রুমে যাও। ওখানে বৃন্দা আণ্টির হাজব্যান্ড তোমার জন্য ওয়েট করছে।

আমি তরুণ সুদর্শন ডাক্তারটির সঙ্গে দ্বিতীয় বারের আলাপেও কেন জানি না করমর্দন শুরু করে দিলাম। আমাদের দুজনের পেটেই বেশ কিছু লাগার বিয়ার পড়েছে। আমার বেশ ভাল লাগল সুমিতকে। সুমিত বলল, তা হলে একটা দিন ঠিক করুন

কবে আসবেন। আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।
বললাম, ঠিক এখনই পারছি না। যদি ক'দিন বাদে একটু ফোন করেন নির্মলদার এখানে।
সুমিত বলল, নো প্রবলেম! আমি ফোন করব।
—কিন্তু তারপরেও একটু প্রবলেম থাকছে। আমি যাব, যদি বৃন্দা গান শোনান।
আকাশ থেকে পড়ল যেন সুমিত। একটু থমকেই রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনি কী করে জানলেন যে ও গান জানে? নিশ্চয়ই নির্মলদা বলেছেন?
একটু চাপা গর্ব নিয়েই বললাম, আমি সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার ছেলে। আমরা লোকের মুখ দেখেই টের পাই কে কী জানে বা জানে না।
বৃন্দা বলল, না, আপনি একটু ভুলও করলেন মিস্টার মুখার্জি। সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার লোকেরা গান শোনানোর প্রতিশ্রুতি থাকলেও অনেক সময় আসেন না।
আমি প্রতিবাদ করে বলতে গেলাম, না, না, আমি তা নই। কিন্তু কথাটা আটকে রইল জিভ আর গলার মাঝখানে কোথাও।
সুমিত হঠাৎ আমার সাহায্যে এল। বলল, মিস্টার মুখার্জিকে কিন্তু ডেট ফেল করার লোক বলে মনে হচ্ছে না। তারপর আমার হাতে ফের হাত রেখে বলল, না, না, আপনি প্লিজ আসুন।
আই উইল ফোন ইউ।
আমি বললাম, বহুদিন ভাল বাংলা আধুনিক শুনিনি। বৃন্দা কি কিছু পুরনো আধুনিক জানেন?
ঘাড় নেড়ে বৃন্দা বলল, এক কালে কিছু জানতাম। এখন রবীন্দ্র-সঙ্গীত ছাড়া কিছু গাই না।
বুকে একটা চিনচিনে ভাব হচ্ছে হঠাৎ। একটা ভয়ও। হয়তো এই গানের নিমন্ত্রণও রক্ষা করা হবে না। সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার ছেলেদের দুর্নাম থেকেই গেল।
আমি হয়তো জীবনে শেষবারের মতো বৃন্দাকে দুচোখ ভরে দেখছি। আর সোমা কখন এসে হাতে ধরিয়ে দিল ডেসার্টের প্লেট।

লাভিং ইউ

সন্ধে নেমে এল, নিরু ছাদের এক কোণে ঠায় বসে, কিন্তু ওর ঝিল্লি পায়রাটা এখনও ফিরে এল না। বুকের মধ্যে একটা ভয় দুপদুপ করছে নিরুর, টিপটিপ করে পাড়ার একেকটা বাড়িতে আলো জ্বলে উঠছে। কানে এখনও মাখামাখি হয়ে আছে খানিক আগে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া উড়োজাহাজের 'হোঁ ও ও ও ও ও ও ও…' আওয়াজটা। নিবু নিবু নীল আকাশের একটা পাশ মেঘে কালো হয়ে এসেছে। কাকা সকালে কাগজ পড়তে পড়তে বলেছিল, আজ রাতে বর্ষা নামবে। নিরুর খুব আহ্লাদ হয়েছিল তখন। অথচ এখন বৃষ্টির কথা ভেবে ওর কান্না পাচ্ছে। এই নিয়ে ওর তিন তিনটে চিঠির উত্তর করল না নন্দিনী। যে কিনা শেষ চিঠিতেও কেঁদে কঁকিয়ে লিখেছিল, তোমার চিঠির দেরি দেখলে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে।

রাগের মাথায় জোরে জোরে নিরু বলল, ছাই করে! সব মেয়েই ওই সব বলে। কোনও মেয়েরই কোনও মনুষ্যত্ব নেই। তারপর একটু থেমে বলল, শুধু মা ছাড়া।

হঠাৎ কোত্থেকে এক টিপ জল এসে পড়ল নিরুর নাকে। নিরু ওপরে চেয়ে দেখল কালো মেঘগুলো আকাশের এক পাশ থেকে হাওয়ায় ভেসে মধ্যিখানে চলে এসেছে। জলের ফোঁটাগুলো বাড়তে থাকলেই বৃষ্টি হয়ে যাবে। আর তখন পায়রাটার বাসায় ফেরার কোনও পথ থাকবে না।

নিরুর বুকের ধুকপুকুনি ক্রমেই বাড়ছে। ঝিল্লি, দাদার পায়রা। দাদা ট্রেনিং দিয়ে ওকে এখানে ওখানে পাঠায়। দাদার আইডিয়াই নেই নিরু ওর পায়রাকে দিয়ে প্রেমপত্র পাঠানো শুরু করেছে নন্দিনীদের বাড়ি। পায়ে চিঠি বেঁধে ঢিলে কোঠার ছাদে চড়ে

নির্ ঝিল্লিকে নন্দিনীদের চারতলার বারান্দাটা দেখায়। মুখে আদর করে ডাকে, ঝিল্লি ! ঝিল্লি ! ঘাড়ে, মাথায় নরম করে হাত বুলিয়ে দেয়। তখন আরামে, আবেগে নানান রকম ধ্বনি করে ঝিল্লি। তারপর একটু হাত আল্‌গা দিলেই পত্‌পত্‌ করে উড়ে যায় উত্তর-পশ্চিম কোণে নন্দিনীদের বাড়ির নিশানায়। নিরু তখন স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে চিলে কোঠার ছাদ থেকে। আর ঢুকে পড়ে চিলে কোঠায় ওর পড়ার জায়গায়। খুলে বসে পড়ার বই, যার ওপর শুধু চোখ ভাসে। কান দুটো একটু একটু গরম হয়, মন শুধু গোনে মিনিট, মিনিট আর মিনিট…

খুব রাগ হচ্ছে নিরুর। নাক থেকে ও বৃষ্টির জল মুছল না। ঝিল্লি না ফিরলে মার আছে কপালে ওর। আর ফেরেও যদি নন্দিনীর চিঠি নিয়ে পায়ে সটান দাদার হাতে তাহলে…উঃ ! নিরু সে দৃশ্য ভাবতেও পারছে না। তাহলে শুধু মার নয়, রীতি-মতো লাঞ্ছনা আছে কপালে। নিরু আস্তে করে আলসে থেকে নেমে গুটি গুটি হেঁটে গেল চিলে কোঠার ঘোরানো সিঁড়ির দিকে। যখন কানে ভেসে এল বাড়ির পিছনে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে লোরেনের ফ্ল্যাট থেকে গ্র্যামের আওয়াজ। গমগমে আওয়াজে এলভিস প্রেসলি গাইছে 'লাভিং ইউ, জাস্ট লাভিং ইউ।'

নিরুর আর চিলে কোঠার ছাদে চড়া হল না। ও চিলে কোঠাতেই ঢুকে পড়ে পিছন দিককার জানালা খুলে আসন করে বসল। ওর ঘর অন্ধকার, কিন্তু লোরেনের ঘরের আলো ফ্যাটফ্যাট করে জ্বলছে। লোরেন একটা বড় টার্কিশ তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে জামা ইস্তিরি করছে গানের ছন্দে ছন্দে। একটু পরেই হয়তো তোয়ালেটুকুও খসিয়ে দেবে শরীর থেকে যদি টের পায় নিরু ওকে দেখছে। নিরুকে দেখিয়ে দেখিয়ে বেলি ডান্স কি স্ট্রিপ টিজ করা ওর বদভ্যাস। নিরু জানে সেটা। নিরু বিব্রত হয়। সব দেখে আরও বেশি করে অসভ্যতা করে ফিরিঙ্গিটা। নিরুর দিদি বলে লোরেন সুইন্টনের জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই হল বিখ্যাত বেলি ডানসার হওয়া। হয়তো হয়েও যাবে কোনদিন। শুধু নিরুই

জানে কত বড় বেহায়া ওই লোরেন। কত বড় অসভ্য ও।

কিন্তু এখন নন্দিনীর ওপর রাগ করে নিরু চোখ ভরে দেখতে চাইছে ওই অসভ্য মেয়েটাকেই। ষোল বছরের দুধ সাদা ওর পেলব ওই শরীর, ওই দুটো বুক, ওই কোমর, পা আর···লজ্জায় জিভ কাটল নিরু। মনে পড়ল সেদিনই কাকা বলছিল নিরুকে বোর্ডিঙে ভর্তি করে দেবে। অসভ্য ছেলেমেয়েতে নাকি ভরে গেছে পাড়াটা। তাও তো কাকা নিরুর প্রেমপত্রের কথা জানে না! জানেনা চিলে কোঠায় পড়া করতে করতে কত খারাপ খারাপ জিনিস দেখে ফেলে নিরু! কাকা ভাবতেও পারবে না বাবামরা ছেলেটা সারাদিন একলা বসে বসে কত খারাপ খারাপ কথা ভাবে। হঠাৎ নন্দিনী, কাকা আর নিজের ওপর একই সঙ্গে অভিমান হল নিরুর। ও গজরাতে গজরাতে বলল, আমি খারাপ হয়ে যাব! আমি খারাপ হয়ে যাব! আমার কেউ ভাল করতে চেওনা। বলে খট্ করে জ্বালিয়ে দিল ঘরের বাতিটা। যাতে লোরেন টের পায় যে ওর একলা বালক দর্শক আসনে হাজির।

আলো জ্বলতেই লোরেন ঘাড় ঘুরিয়ে নিরুদের ছাদের দিকে তাকাল। ওর এক রাশ সোনালি চুলের পাপড়ি চোখের ওপর থেকে হাত দিয়ে পাশে সরিয়ে রাখল। একটা দুষ্টু, শয়তানি হাসিও হয়তো হাসল। তারপর গ্র্যামের দিকে সরে গিয়ে গানের আওয়াজ আরও জোর করে দিল। এলভিসের 'জেলহাউজ রক্' গানটা গাঁক্ গাঁক্ করে চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। উত্তেজনা বোধ করে নিরু হঠাৎ করে বলেই বসল, হাই লোরেন! আই'ম হিয়ার! আর তখনই ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামল।

বৃষ্টি নামলে খট্‌খটাস্ খট্‌খটাস্ করে কাঠের জানালা বন্ধ হওয়ার একটা চেনা শব্দ আছে এপাড়ায়। কিন্তু অনেক দিনের গরমের পর আজকের এই প্রথম বৃষ্টিতে জানালা টানালা সেভাবে বন্ধ হল না। নিরু নিজেও জানালা দেওয়ার কথা ভাবছে না। কিন্তু লোরেনই এগিয়ে এসেছে ওদের ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো টেনে দিতে। একই সঙ্গে সব জানালা আর দরজা। প্রথমে নিচের দরজার ভাগটা টেনে দিল মেয়েটা। তারপর জানালার অংশ টানতে টানতে

নির‍ুর দিকে মুখ তুলে বলল, নির‍ু! ড্রপ ইন টুনাইট। ইটস মাই বার্থডে। তারপর ইস্তিরির টেবিল থেকে লম্বা সিল্কের গাউনটা তুলে ধরে বলল, মাই বার্থডে ড্রেস। ইজন্‌ট ইট বিউটিফুল? নির‍ু বলল, ইয়েস! কিন্তু বৃষ্টির ঝমঝমানিতে কিছু শোনা গেল না। নির‍ু সজোরে টেনে দিল ওর নিরিবিলি পড়ার ঘরের জানালার পাল্লা। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। যতক্ষণ না বৃষ্টি থামে।

কখন বৃষ্টি থেমেছে নির‍ুর হুঁশ নেই। জানালা-দরজা বন্ধ কুঠরিতে ওর হাঁপ ওঠার কথা, কিন্তু নির‍ু যেন নির‍ুর মধ্যেই নেই। রাগ হলে ছোটবেলায় ফিট্ হয়ে যেত নির‍ু। তাই ভয়ে ভয়ে কেউ বড় একটা শাসন করেনা ওকে। মার হাত ওঠে না ওর মুখের দিকে চাইলে। ঠিক যেন ওর বাবার মুখটি বসানো। নির‍ুর ওপর রাগ হলে কাকা চাকরবাকরদের খামাখা গালিগালাজ করে। কিল, গাঁট্টা মা মারার দাদাই মারে। সে যখন নির‍ু ওর লাটাই ভাঙে কি পায়রাদের জ্বালায়। তখন রে রে করে দাদার দিকে ছুটে আসে চাকর চিন্তা, ভানু কি বড়ঠাকুর।

বৃষ্টির আওয়াজ থেমেছে বলে চিলে কোঠায় পায়রাদের 'গুগুরগু! গুগুরগু!' কানে আসছে। কিন্তু সে সব শুনেও শোনা হচ্ছেনা নির‍ুর। ওর তিন তিনটে চিঠির জবাব দেয়নি নন্দিনী। আর একটু আগে লোরেন ওকে জন্মদিনে ডেকেছে। যে লোরেনের বাড়ি ও কোনদিনও যাবেনা বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। গেলেই তো খারাপ হয়ে যাবে! ওকে ন্যাংটা হওয়া নাচ দেখায় মেয়েটা দূরে থেকে। হাতের নাগালে পেলে কী করবে কে জানে! কথাটা মনে হতেই আপনা থেকে মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল একটা নিষিদ্ধ শব্দ—প্রস্টিটিউট! সদ্য শিখেছে উজ্জ্বলদার থেকে। যার মানে নাকি……

ডানা ঝাপ্টানোর আওয়াজ হল বাইরে! ফত্‌ফত্ ফত্‌ফত্… তারপর ঝিল্লির ডাক কর্‌র্ কর্‌র্‌র্…নির‍ু 'ঝিল্লি!' বলে ডেকে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। আর অমনি ফত্‌ফত্ করে পায়রাটা ঢুকে পড়ল ঘরে। জায়গা মতো বসতে গিয়ে গা ঘষে গেল নির‍ুর

সঙ্গে। আহা বেচারি! ভিজে নেতিয়ে আছে। কোথায় ছিল এতক্ষণ? নিরু টক্ করে লাইট জ্বালিয়ে দিল। ইচ্ছে হচ্ছে জামা দিয়ে ওর গা মুছিয়ে দেয়। কিন্তু ওমা, ওকি! ওর পায়ে তো কোনও চিঠি নেই! নন্দিনী নিরুর চিঠিটা খুলে নিয়েছে, কিন্তু নিজের চিঠিটা দেয়নি।

রাগে দপ্ করে জ্বলে উঠেছে নিরুর মাথা। ও ফের লাইট নিবিয়ে দুদ্দাড় করে নেমে এল নিচে। মা বেরুচ্ছিল ঠাকুর ঘর থেকে, ও সোজা সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, মা, দুটো টাকা দেবে? কাকা এলে দিয়ে দোব।

মা বুঝল না নিরুর হঠাৎ দুটো টাকার প্রয়োজন হল কেন। 'আর কাকা এলে তা ফেরৎ করার কথাই বা উঠছে কেন। একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল মা, কেন, দুটো টাকার কী দরকার?

নিরু বলল, লোরেনের জন্য গিফট কিনব।

মার রহস্য কাটল না। বলল কে লোরেন? ওই ধিঙ্গি ফিরিঙ্গিটা? নিরু কিছু মনে করল না। লোরেন সম্পর্কে সব্বাই এইভাবে কথা বলে। ও শুধু বলল, ওর জন্মদিন আজ।

তা সে তো তোমার দিদির বন্ধু। তোমাকে নেমন্তন্ন করে কেন? আপনা থেকে ওর সেই ছোটবেলার রাগটা বেরিয়ে এল। নিরু ঝাঁঝ করে বলল, সে তোমায় জানতে হবেনা!

মা বোধ হয় ওর বাবাকেই দেখল ওর মুখের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে গলা নামিয়ে বলল, দিচ্ছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে। আর কাকার থেকে নিয়ে ফেরৎ দেওয়ার দরকার নেই।

নিরু কিছু না বলে টাকা নিয়ে হলঘরের একধারে রাখা চটি পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে গেল মুকুন্দর দোকানের দিকে। যেখানে কদিন ধরে কিছু নতুন ফিতে আর ইয়ো-ইয়ো ঝুলছে। লোরেনের কালো গাউনের সঙ্গে মানাবে বলে এক জোড়া সাদা রিবন কিনল ও। আর একটা লাল ইয়ো-ইয়ো। তারপর পাশের গলি দিয়ে জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে পড়ল লোরেনদের বাড়ির দিকে।

লোরেন বিশ্বাসই করতে পারছে না সত্যিই নিরু ওটা ওর বার্থডে ভেবেছে। আসলে ও তো ঠাট্টা করেছে। কিন্তু এখন নিরুর

হাতে রিবন আর ইয়ো-ইয়ো দেখে একেবারে ব্যাজার। ও যে কী বলবে তাই মুখে জোগাচ্ছে না। ও শুধু বলল, ইউ রিয়েলি থট্ ইটস্ মাই বার্থডে?

নিরুর কান্না পাচ্ছে। ও কোনও মতে গলার কাছটায় জমে ওঠা কান্নার দলাটাকে নিঃশ্বাসে চেপে বলল, আই বিলিভড্ ইউ, লোরেন!

ফের একবার যেন সাপের ছোবল খেল মেয়েটা, কিছুতেই আর অবস্থাটাকে হাল্কা করে আনতে পারছে না। ভয়ে গা-ঝাড়া হাসিও হাসতে পারছে না। পাছে অভিমানী ছেলেটা রেগে ফেটে পড়ে।

ও আস্তে করে হাত বাখল নিরুর গায়ে। নিরুর গা ঘেন্নায় গুলিয়ে উঠল। মেয়েগুলো পেয়েছে কী ওকে? সব কটা প্রস্টিটিউট! বেশ্যা! ও এক ঝটকায় লোরেনের হাত সরিয়ে দিল গা থেকে। লোরেন ওর হাত থেকে উপহারগুলো নিয়ে গালে ঠেকাল। নিরু সেদিকে ফিরে চাইলও না। একটা প্রতিশোধের ভাব জাগছে ওর ভেতরে। বাড়িব পথে ও নন্দিনীদের জানালায় একটা ঢিল ছুঁড়বেই। আর সেটাই ওদের ভালবাসার শেষ কথা। ও তড়াক্ করে দিভান থেকে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে পা বাড়াল। আব কিছু ঠাউরে ওঠার আগে আটকে পড়ল লোরেনের বুকের মধ্যে। লোরেন ওকে জাপ্টে ধবে গালে গাল ঘষছে, ঠোঁটে চুমু খাচ্ছে। জড়িয়ে জড়িয়ে অসভ্য ইংরিজিতে কী সব বলছে কানে ফিস-ফিসিয়ে। ও শুধু একটা কথারই হদিস করতে পারছে—আই লাভ ইউ, লিটল লাভার, লিটল লাভার…

এক অদ্ভুত অনুভূতিতে শরীর অবশ হয়ে আসছে নিরুর। ও হাত দিয়ে অনুভব করছে লোরেলের বুক দুটো। কী মিষ্টি স্পর্শ! কী ভীষণ অন্যরকম সব কিছুর থেকে! অবশ হতে হতে ও গড়িয়ে পড়েছে দিভানে। লোরেন সেই সুযোগে ফের চালিয়ে দিয়েছে এলভিসের গান 'লাভিং ইউ, জাস্ট লাভিং ইউ।' তারপর ফিরে এসে ফের আঁকড়ে ধরেছে নিরুকে। নিরুর হাতও…

হঠাৎ প্রবল চেঁচামিচি বাইরে। বেহেড মাতাল কিছু জাহাজি

লোক হৈ হৈ করে ঢুকে পড়েছে ফ্ল্যাটে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইংরিজি গান গাইছে লোরেনের মা মার্লিন। নিরুকে ছেড়ে দিয়ে দিভানে প্রথমে সোজা হয়ে বসল লোরেন। তারপর দু হাতে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল, দ্যাট বিচ্ উইল নেভার গিভ মি পিস। নেভার! নেভার! নেভার! ওর চোখের গরম গরম জলের ফোঁটা ছিটকে এসে পড়ল নিরুর গায়ে। আর ওর মনে পড়ল নন্দিনীকে, যাকে ও একবার এভাবে কাঁদতে দেখেছে। যখন ওর দিদি কলেজের প্রফেসরের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করে চলে গেল।

নিরু উঠে ঘরের দরজা খুলে দাঁড়াল। দেখল তিনটি যুবক প্রায় চ্যাংদোলা করে আনছে মার্লিনকে। মার্লিন নেশায় চুর, কিছুই দেখছে না চোখে, শুধু জোরে, জোরে বেসুরো ভাবে গেয়ে যাচ্ছে 'নেভার অন আ সানডে।' মার্লিন নিরুকে দেখতেও পাচ্ছে না, লোকগুলোকে বলতে শুনল, হাই বয়! ইউ নিভ আ ওম্যান?

নিরু জোরে পা চালিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। ভাবল, দিদি ঠিকই বলে যে লোরেনের মা একটা যাচ্ছেতাই। আইজায়াস না কী একটা বার-এ গান গায়। যার-তার সঙ্গে মেশে। সুন্দরী মেয়েটাকেও খারাপ করে দিতে চায়। কিন্তু লোরেন হবেনা। ও সত্যিকারের বড় ডান্সার হতে চায়।

বাড়ি ফিরে আর খিদে পেলনা কিছুতেই নিরুর। মাকে, কাকাকে, বড়ঠাকুরদাকে বলল, খুব খেয়েছি লোরেনের জন্মদিনে। তাও জোর করে এক বাটি দুধ গেলালো মা। তারপর কাকার ঘরে কাকার বিছানায় গিয়ে মুখ গুঁজে শুলো। কারণ শুধু খিদে নয়, ওর ঘুমও বোধ হয় চিরতরে কেড়ে নিয়েছে লোরেনের চুমু, বুকের স্পর্শ, গায়ের গন্ধ। মনে পড়ল নন্দিনীর ঠোঁট। যে-ঠোঁটে কোনোদিনও চুমো দেওয়ার সাহস হয়নি নিরুর। নন্দিনীকে ছুঁতেই পারেনি কোনদিন।

এটা মনে হতে নিজেকে খুব পাপী মনে হল নিরুর। নিজেকে ঘেন্না হল। বুঝতে পারল যে লোরেন যা করেছে তার জন্য সে নিজেও অনেকখানি দায়ী। নিরু তো সত্যিই…নিরুর চোখ ফেটে জল আসছে। জেগে থাকা আর ঘুমের মধ্যে একটা আবেশের

জায়গা আছে। যেখানে তলিয়ে যাচ্ছে নিরু। কতক্ষণ এভাবে ও মুখ গুঁজে পড়ে ও ভুলেও গেছে। কাকা এসে না ডাকলে ও উঠবে না।

কিন্তু ও এখন স্পষ্ট শুনল কাকা মাকে বলছে, আমি জানি তোমার কষ্ট হবে বৌদি। তাহলেও বলছি নিরুকে আমি ভাল বোর্ডিঙে পাঠিয়ে দোব। এখানে থাকলে ও নষ্ট হয়ে যাবে।

কাকা একটু চুপ করল। মা-ও চুপ। তারপর মা বলল, ওকে নিয়েই তো থাকি। এত ছোট।

কাকা বলল, সে কষ্ট কি আমার নেই, বৌদি ?

মা বলল, ও তো পড়াশুনোয় এত ভাল। কী এমন হল ?

কাকা বলল, সেজন্যই তো ভাবি। পাশের রাস্তার নন্দিনী বলে মেয়েটা আছে, ওর বাবা আমাকে আজ তিনটে লাভ লেটার দিলেন। বলছেন, নিরু লিখেছে ওর মেয়েকে।

মা আঁৎকে উঠে বলল, সে কী !

কাকা বলল, কিন্তু বৌদি, কী সুন্দর চিঠি সেগুলো। ভাবতেই পারছি না আমাদের নিরু লিখেছে। ও কত নিঃসঙ্গ, একলা, আমরা কোনও খবরই রাখিনা। আমরা তো ওকে নষ্ট করে ফেলব !

নিরু শুনল মার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে ওর, কিন্তু ও কখনই সেটা করবে না। মা, কাকা কেউ তো ওকে কিছু বলেনি। ও কাঁদলে ওরা লজ্জা পাবে, দুঃখ পাবে। আর ওকে ভেতরে ভেতরে মরে যেতে হবে। ও বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল ভাঙা পুতুলের মতো।

আরও রাতে কাকা যখন এসে ওর পাশে শুলো ও উঠে বসে ধরা গলায় বলল, কাকা, আমায় বোর্ডিঙে ভর্তি করে দাও। নিরুর মুখে এ কথায় কাকা বেশ হকচকিয়েই গেছিল। উঠে বসে নিরুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করল, কেন, কী হয়েছে বাবু ?

নিরু কান্নায় ভেঙে পড়ে কাকার কোলে মুখ লুকিয়ে বলতে লাগল, এখানে থাকলে আমি খারাপ হয়ে যাব, কাকা ! এখানে থাকলে আমি খারাপ হয়ে যাব !

টিভিতে একটা দারুণ হরর্ ছবি দেখা হচ্ছিল হাতে বিয়রের কৌটো নিয়ে। ভয় বা সাসপেন্স কোথাও কম হলে বাপী যেন কিছু বলি-বলি ভাব করেও থেমে যাচ্ছিল।

একবার-দুবার ভেবেওছিলাম ও বলতে চাইছে-টা কী? অন্ধকার ঘরে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিলাম ওর মুখের হাবভাব। মনটা একরকম ডুবেই আছে টিভির হররে। আবার কিছুটা ভেসেও আছে কোথায় যেন একটা। ভয়ের ছবির টেনশনের সঙ্গে অন্য কী একটা টেনশনও যেন মিশেছে।

কিন্তু বাপীর টেনশন। টেনশন কথাটাই যেন ওর ডিক্সনারিতে নেই। যে-কোনও পরিস্থিতিতেই ঠাণ্ডা মাথায় টেনে টেনে কথা বলাই ওর স্টাইল। টুকিটাকি ব্যক্তিগত হিসেব লেখার সময়ও হাল্কা করে চালিয়ে রাখে বব ডিলান কি মেহেদি হাসানের গান। দাড়ি কামাবার সময়ও জ্বলন্ত 'ক্যামেল' সিগারেট একটা শোয়ানো থাকে বেসিনের ধারে অ্যাশট্রেতে। গোটা কয়েক ব্লেডের পোঁচ দিয়েই সাবান লেপা মুখে দু'এক টান দিয়ে নেয় সিগারেট। সা টেনশন থেকে নয়, আরামে।

ও যখন ছুটির দিন দুপুরে লাঞ্চের পর লেনিন বা মাওদের বই মুখে নিয়ে আরাম কেদারায় বসে তখন ক্ষণিকের জন্য টের পাই ও আসলে কী ছিল কলেজে। ডাকসাইটে নক্সাল অ্যাক্টিভিস্ট। বোম ছুঁড়ছে, ছুরি চালাচ্ছে, পুলিশের বন্দুক কাড়ছে, একেক রাত একেক পল্লীতে শুচ্ছে, ক্কচিৎ কখনো কফিহাউস বা কলেজ স্ট্রীটের গলিগালায় দেখা হলে সোৎসাহে কুশল জানছে, 'তোরা বেঁচে আছিস তো?'

আমরা তখন মনে-মনে হাসি। কেন, আমাদের মরার কী হয়েছে? আমরা কি রাজনীতি করে বেড়াচ্ছি। আর সেই প্রশ্ন শুধোচ্ছে রাজনৈতিক শত্রু আর পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বেড়ানো বাপী।

তারপর এক সময় পালাতে পালাতে বাপী এই লণ্ডনে। মস্তবড়

হোটেলে বড়সড় চাকরি আর রেকর্ড, বই নিয়ে ভুলে আছে সবকিছু। আমি কাজেব যোগাযোগে মাস কয়েকের জন্য লণ্ডন এসে প্রথম ওকে খবর দিলাম, তোদের বোধহয় পালিয়ে বেড়ানোর ইতি হল। বামফ্রণ্ট সরকার তোদের বিরুদ্ধে যাবতীয় কেস উঠিয়ে নিচ্ছে।

কথাটা শুনে বাপী খুশী হয়েছিল, না হয়নি বোঝার উপায় ছিল না। সাদামাঠাভাবে শুধু বলেছিল, ভাল।

আর বাপী এখন আমার পাশে মোটা লেপ চাপা দিয়ে নরম কার্পেটে শুয়ে। ঘুমোয় যে নি তার যথেষ্ট ইঙ্গিত ওর থেকে-থেকেই এপাশ-ওপাশ করা, যা ও কখনই করে না। হোটেলে কাজ করার দরুণ বিয়ার-হুইস্কিটা প্রায় নিখরচায় হয়। নেশায় থাকে বলে বিছানায় পড়ে আর ঘুমোয়। যেটা আজ হচ্ছে না। যদিও ছুটির সন্ধেয় হরর ছবি দেখতে দেখতে বিয়ার কিছু কম পড়েনি পেটে।

এপাশ-ওপাশ করতে করতে একবার আমার দিকে পাশ ফিবে ডেকে উঠল বাপী, অ্যাই নীতিন, ঘুমিয়ে পড়লি ?

আমি মোটেও ঘুমিয়ে পড়িনি, কিন্তু দর বাড়ালাম প্রথম ডাকে সাড়া না দিয়ে। বাপী ফের ডাকল, অ্যাই নীতিন।

আমি ঘুম জড়ানো গলার ভান করে বললাম, কী ?

বাপী বলল, সকালবেলায় বাবলিকে দেখলি ?

বাবলিকে সেদিন সকালেই দেখেছিলাম বাপীর ফ্ল্যাটে। ভারি সুন্দর দেখতে মেয়েটি। যাকে বলে বিউটি। একটু চাপা গায়ের রঙ, যাতে রূপ আরও ফুটেছে। একটু মেমসাহেব-মেমসাহেব ভাবও আছে চেহারায়। স্মার্ট কথাবার্তা, দারুণ ইংরেজী অ্যাকসেণ্ট। যদিও মাত্র মাসকয়েক হল বিয়ে হয়ে লণ্ডন এসেছে। একটু বুঝি গর্ব করেই বলছিল, আমি কিন্তু লণ্ডনের প্রোডাক্ট নই, নীতিনদা। ষোল আনা কলকেত্তে। লোরেটো মিডলটন।

কিন্তু আমি নজর করেছিলাম আরেকটু বেশী কিছু। হাসিখুশী মেয়েটি আসলে বেশ বিষন্নও। সুন্দর মুখে সেরকম একটা ছায়া আছে। অনেকক্ষণ কথা বললে হঠাৎ-হঠাৎ 'আহা! উহু'-র!

মধ্যে বেরিয়েও আসে। ব্যাপারটা আমি নজর করেছিলাম, কিন্তু আমল দিইনি। অন্যের ব্যাপারে এধরনের শৌখিন গোয়েন্দাগিরি ভাল নয়। আমার আসেও না।
বাবলি চলে যেতে বাপী বলছিল, ও হল নীলুর বৌ। নীলুকে তো তুই চিনিস!
চিনি বৈকি! নীলুকে চিনব না। কদিন আগেই তো নিউক্যাসল থেকে উইকএন্ডে এসে কীরকম হৈ-চৈ করে গেল। আর কী দেবদূতের মতো চেহারা। এত সুন্দর নিটোল ফর্সা ধবধবে চেহারা যে হঠাৎ দেখলে মেয়ে মনে হয়। তার ওপর পরেছিল লাল টকটকে ফুলহাতা সোয়েটার। সোয়েটার 'ভি' কাট কলারের কাছে কালো টাই ঝকঝক করছে সাদা শার্টের ওপর। দেখে বুঝেছিলাম ছেলে খুব শৌখিন আর সেল্ফ কনশাস। বিয়ার খেতে খেতেও বেশ তাকিয়ে নিচ্ছিল পেছনের আয়নায়।
আমি লেপের ভেতরেই পাশ মুড়লাম বাপীর দিকে। বললাম, দেখলাম তো বাবলিকে। কেন কী হয়েছে?
বাপী বলল, নীলু ওর থেকে ডিভোর্স চেয়েছে।
হঠাৎ করে আমাদের উষ্ণ বিছানায় কে যেন ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে! শুধু বিস্ময় নয়, কীরকম একটা আতঙ্ক হল ভেতরে। অত সুন্দর একটা ছেলে অত সুন্দর একটা মেয়েকে ছেড়ে দিতে চায়। কেন, কী হতে পারে ওদের মধ্যে? এই তো সবে বিয়ে করে এল।
বললাম, ডিভোর্স কেন? নীলু কি কোনও মেমসাহেব নিয়ে পড়ল?
বাপী বলল, মেমসাহেব নয়, জাস্ট সাহেব।
তার মানে!
নীলুর প্রেমিক একটি পুরুষ। নীলুর অধ্যাপক।
কী বলছিস কী? ইউ মিন নীলু ইজ আ হোমোসেক্সুয়াল?
হ্যাঁ। আরও চলতি ভাষায় বলতে গেলে হি ইজ আ গে। গে কথাটা শুনেছিস?
আমি এতই অবশ হয়ে গেছি ভেতরে ভেতরে যে বাপীর কথার উত্তর

দিতে ইচ্ছে হল না। বাপী ভাল করেই জানে যে ইংরেজী ডিক্স-
নারির কোনও শব্দই প্রায় আমার অজানা নয়। ওটা বলে ও
বোধহয় আমাকে একটু চটাতেই চেয়েছে। আমি গা করলাম না।
চুপ করে রইলাম।

বাপী ফের বলল, ট্রাজেডিটা কী জানিস ? নীলু আর বাবলির প্রেম
সাত-আট বছর বয়স থেকে। দু'বছর আগে যখন বিলেতে পড়তে
এল নীলু তার আগে ওদের আশীর্বাদও হয়ে গেছে। কিন্তু ছ'মাস
আগে যখন ও দেশে ফিরল বিয়ে করতে ও পুরোদস্তুর গে।

উত্তেজিত হয়ে আমি কথার মধ্যেই জিজ্ঞেস করে বসলাম, তো সে
কথা ও জানাবার প্রয়োজন বোধ কবল না বাবলিকে ?

অন্ধকারের মধ্যেই বালিশের আশপাশ হাতড়ে বাপী সিগারেটেব
প্যাকেট বার করল। একটা নিজে ধরিয়ে আরেকটা আমার দিকে
বাড়িয়ে দিল। ঘুমের দফারফা তো হয়েইছে, সেক্ষেত্রে আরেকটু
ধুমপান হলে মন্দ কী ? আমিও সিগারেট ধরালাম।

একটা লম্বা সুখটান দিয়ে বাপী বলল, নীলু সবিস্তারে সব
জানিয়েছিল। ব্যাপার-স্যাপার জেনে বাবলির বাবা-মা বিয়ে ভেঙে
দিতে চায়। কিন্তু বাবলি দেয়নি। বলেছিল ওকে ছাড়া আমি
কাউকে বিয়ে করতে পারব না। ওর গোঁ ছিল ও বিযে করে বরকে
শুধরোবে। আমি বললাম, পারেনি ?

বাপী মাথা নাড়ল। বাপী সিগারেট খাবে বলে উঠে বসেছিল।
জানালার বাইরে থেকে স্ট্রীটলাইটের এক মৃদু রশ্মি ঘরের একটা
দেওয়ালে এসে পড়েছিল। তাতে ততটুকুই আলো হচ্ছিল যাতে
মানুষকে ছায়া হিসেবে ঠাওর করা যায়। আর তাতেই আমি
বুঝলাম বাপী মাথা দুলিয়ে না বলছে।

আমি ফের বললাম, অগত্যা ?

অগত্যা ডিভোর্স। তার আগে একটা শেষ চেষ্টা করব কিনা
ভাবছি।

শেষ কী চেষ্টা ?

ওই সাহেবটাকে বোঝানোর।

কী বোঝাবি ? আর সে চেষ্টা কি বাবলি করেনি, ভাবছিস।

না, মোটেও তা ভাবছি না। কারণ বাবলি তা করেছে। ওকে নাকি জিম বলেছে যে, কেউ যদি তোমার প্রেমিককে কেড়ে নিতে চায় তাতে কি তুমি সম্মতি দেবে ?'
কথাটা শুনেই কেমন রি-রি করে উঠল গা-টা। সামনে লোকটা থাকলে হয়তো ঠেসে চড় কষিয়ে দিতাম। কথার ছিরি কী পুরুষ মানুষের !
বললাম, তাহলে আর কী চেষ্টা করবি তুই ?
বাপী গলা নামিয়ে বলল, চেষ্টা আর কী ! গিয়ে শালাকে তিন ঠুসো মারব। চোয়াল ভেঙে দেব। প্রচণ্ড ঝামেলা পাকাব।
আমার মনের ওপর ঝিলিক দিয়ে গেল আট-ন'বছর আগের সেই বাপী। নক্সাল আন্দোলনের আগুন আর বোমার মাঝখানে হাতে পেটো নিয়ে দাঁড়িয়ে একরোখা ছেলেটা। ফুঁসছে।
আমি ওর আজগুবি উচ্ছ্বাসে জল ঢালার জন্য বললাম, তাতে আর কী সুবিধে হবে বাবলির ? নীলু যদি হোমোসেক্সুয়ালই হয়ে থাকে তাহলে সবার আগে সারানো উচিত তো ওই হারামজাদাকে। সাহেবকে মেরে ভাগাতে কতক্ষণ ? কিন্তু তাতে কি ঘরের ছেলেটার চরিত্র সংশোধন হবে ? সে তো আবার একটা পুরুষ ধরবে।
রাগের মাথায় প্রিয় বন্ধু সন্তুর ছোট ভাইটাকে খিস্তি দিয়ে ফেলল বাপী, শালা মাদী কোথাকার !
আমি বললাম, এসব তো তোমার লণ্ডনের কালচার বাপু ; ওকে আর দোষ পেড়ে কী হবে ? তাছাড়া, এটা তো ঠিক কারও চরিত্রের ব্যাপার নয়। একটা রোগও। কাল বাদে পরশু তুইও যে হবি না তার কোনও……
থাম তো ! বাজে বকিসনি !—গর্জে উঠল বাপী। একটা কনস্ট্রাক্-টিভ্ চিন্তা কিছু নেই, শুধু ফোঁড়ন কাটা।
এবার আমার খুব হাসি পেয়ে গেছে। বললাম, কনস্ট্রাক্টিভ্ চিন্তা বলতে কী বোঝাচ্ছিস ?
যাতে মেয়েটার দুরবস্থা কিছু ঘোচে।
মেয়েটি দুরবস্থার একটাই সুরাহা। ওই অপদার্থটাকে ডিভোর্স দিয়ে দেশে ফিরে যাওয়া।

অন্ধকারের মধ্যেই দেখলাম বাপী ফের মাথা নাড়ছে। একটু ক্ষণ পর মুখে বলল, না, সেটা হবে না।
কেন ?
বাবলিরা বড়লোক বেনে। ভয়ানক রক্ষণশীল। তালাক দিয়ে মেয়ে বাড়ী ফিরলে পরের বোনগুলোর ভাল বিয়ে হওয়া মুশকিল।
তাহলে ?
ওকে এখানেই থাকতে হবে। যা ও চায়। ফলে ওকে চাকরিও করতে হবে। আর যদি অন্য কাউকে···
বিয়ে ?
হ্যাঁ। তুই করবি ?
তার মানে !
আমি তোরও চাকরির ব্যবস্থা করব যদি তুই···
আমি কী যে বলব ছেলেটাকে বুঝে পেলাম না। আমি এসেছি মাস কয়েকের কাজে, দেশে ফিরে বিয়ের কথা। গার্ল ফ্রেন্ডের ছবি রাখি পার্সে। দিনে একলা থাকলে বার করে করে দেখি। আর এই হতভাগা কিনা···একটু হোঁচট খেলাম ভেতরে কোথায়। সত্যি তো ! আমি তো কোনদিন ওকে আমার বান্ধবী বা বিয়ের কথা কখনও বলিনি। অথচ দেখতে দেখতে কাটিয়ে দিয়েছি তিনটে মাস এক ঘরে।
আমি রেগে না গিয়ে শান্তভাবে বললাম, না, সেটাও হবে না, বাপী। আমি দেশে ফিরেই বিয়ে করছি। ভেবেছিলাম তো কিচ্ছু না বলে সময়মতন সাপ্রাইজ দেব। তো···
বাপী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানি। আমি তোর ওয়্যালেটের ছবিটা তোকে না জানিয়ে বেশ কবার দেখেছি। আর তোকে লেখা নন্দিনীর চিঠিগুলো লুকিয়ে চুরিয়ে পড়েওছি।
এইবার রাগটা এল আমার মাথায়। চিঠি পড়া বা ছবি দেখার জন্য নয়। কেন ও তাহলে ওই কথাটা বলল। বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললাম, তাহলে বাজিয়ে দেখছিলি মন টলে কিনা।
বাপী হাতড়ে হাতড়ে অ্যাশট্রের জায়গা মতো সিগারেটের টুকরোটা গুঁজে দিতে দিতে বলল, তা একেবারেই নয় নীতিন। ভাবছিলাম

ও যদি এমন কাউকে বিয়ে করে যাকে আমি চিনি তাহলে ইচ্ছে মতো বাড়ী গিয়ে ওকে দেখে আসতে পারব। সেই কথাটাই হয়তো ফস্কে গিয়ে……

বাপীর গলা জড়িয়ে আসছিল। কথাটা ও শেষ করতে পারল না। আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে বাপী প্রেমে পড়েছে। আমি ওর পিঠে আল্‌তো করে হাত রেখে বললাম, তুই শুয়ে পড়। কাল তোর অফ-ডে। কাল রবিবারও। সকালে লিটল ভেনিস কাফেতে ব্রেকফাস্ট করব চল। একটা সলিউশন বার কবতেই হবে।

কীরকম অসুস্থ লোকেব মত ধড়াস করে ফের বিছানায় পড়ল বাপী। তারপব হাঁটু ভাঁজ কবে জড়োসড়ো হয়ে শুল। যেন শীত করছে। কতক্ষণ পর ও ঘুমোল আমি জানি না। শুধু সকালে চোখ মেলে দেখলাম বেচারি হাঁ করে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ডাকতে গিয়েও কীরকম মায়া হল। হয়তো সারারাত ছটফট করেছে অনিদ্রায়। ভোর রাতের ক্লান্ত ঘুম হয়তো। আমি গায়ের লেপ সরিয়ে ঘরের এক কোণে বেসিনের দিকে পা বাড়ালাম মুখ ধোব বলে। আর তখনই কীরকম ধড়মড় করে জেগে উঠল বাপী। যেন প্রচণ্ডভাবে কেউ ধাক্কা দিয়েছে ওকে। আর জেগে উঠেই আমার দিকে কীরকম ক্লান্ত, অসহায় দৃষ্টি মেলে বলল, কই, লিটল ভেনিস যাবি না?

একটা সুন্দর খালের পাশে ঘন সবুজ উইলো আর এভারগিন গাছের হাতছানির মধ্যে শিল্পীদের নিজস্ব কাফে লিটল ভেনিস। জলে ঘেরা পল্লীর এই একটেরে কাফের দেওয়াল সাজানো আছে তেলরঙ, জলরঙ, স্কেচ, ড্রইং, লিথোগ্রাফে। শিল্পীদের ভালবাসার উপহার সব। আমরা দুজনে গিয়ে বসলাম একেবারে জানালার গায়ে। আমি জানালার বাইরে জল আর গাছপালা দেখছিলাম। সেই ফাঁকে কখন এক সময় ব্রেকফাস্ট অর্ডার করে বসে আছে বাপী। আমি বাইরে থেকে চোখ ঘুরিয়ে টেবিলের মেনুটা খুঁজতে গিয়ে দেখলাম বেকন হ্যাম, অমলেট ও কফিতে সাজানো আছে টেবিল। আর টেবিলের উল্টো দিকে বিহ্বল চোখে আমার দিকে চেয়ে বসে

আছে বাপী! আমি যেন সেই ডেলফাইয়ের ওরাকল। যার উচ্চারণের ওপর নির্ভর করছে ওর সব সুখ, সব অনুভূতি, সব সাফল্য ও ব্যর্থতা ও সারা জীবন।

আমি কালো কফিতে একটা চিনির কিউব ফেলে গুলতে গুলতে বললাম, বাপী, তুই ওকে বিয়ে কর।

বাপী বোকা ছেলে নয়, ও নিশ্চয়ই আশা করেছিল আমি এরকম কিছু একটা বলব। তা সত্ত্বেও ও চমকে উঠে বলে ফেলল, আমি! আমি ভাব দেখালাম যেন সত্যি কিচ্ছু হয়নি। বললাম, হ্যাঁ, তুই।.

মনের বাসনা অন্যে বুঝে গেলে খুব পুরুষালি লোকেরও লজ্জা হয়। বাপীও বাদ গেল না। ও লজ্জায় পড়ে বেকনের একটা বড় চোকলা মুখে তুলে জোরে জোরে চিবুতে লাগল। আমি আর কিছু বলছি না দেখে ফের বলল, আমি?

বললাম, কেন, অসুবিধে কী?

ফের মাথা নামাল বাপী। জুল জুল করে খাবারগুলো দেখছে আর কী ভাবছে। কিছু বলতেও চাইছে, কিন্তু মুখে কথা জোগাচ্ছে না। আমি সাহায্য করার জন্য বললাম, রাজি হবে না ভাবছিস?

বাপী মাথা নাড়ল। —সে তো অনেক পরের কথা। আমি ভাবছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো। ও শিল্পপতির মেয়ে, আমি ইস্কুলের হেডমাস্টারের। বিদেশে অবিশ্যি এসব কাউকে ভাবতে দেখিনা। আবার ভাবি, রক্ত। রক্তের চরিত্র কি অন্য সমাজে গিয়েও পাল্টায়?

কিন্তু এখানে তো তুই ত্রাণকর্তার ভূমিকায়। তোর কী বড় ল্যাঠা অন্যের বৌয়ের সমস্যা মাথায় নেওয়ার?

বাপী একটু চুপ করে থেকে ফের শুরু করল, এছাড়াও তো সমস্যা আছে, নীতিন।

কীরকম?

ও যে এখনও ভীষণ ভালবাসে নীলুকে। ডিভোর্স নিলে আলাদা থাকতে তো ওকে হবেই। কিন্তু ফিরে বিয়ে করতে চাইবে কিনা বলা মুশকিল।

তাহলে তুই আমাকে বলেছিলি কেন বিয়ের কথা ?
বললাম তো, হঠাৎ করে মুখে এসে গেল। তাছাড়া···তাছাড়া কোথায় যেন একটা ভীষণ মিল দেখলাম তোর আর নীলুর মধ্যে। সোফিস্টিকেটেড, নীচু স্বরে কথা, চেহারা···
আমি চটেমটে বলে উঠলাম, ইনাফ ইজ ইনাফ ! আই অ্যাম নট আ হোমোসেক্সুয়াল ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস।
বাপী হাত দেখিয়ে আমাকে থামিয়ে বলল, প্লিজ ! আমাকে ভুল বুঝিস না। এগুলো হল জাস্ট ফার্স্ট ইম্প্রেশনজ্। তোর সঙ্গে মিশলে বোঝা যায় যে তুই একেবারে অন্য ধরনের মানুষ। কিন্তু এবার তুই আমায় বল, তোর কেন মনে হল আমার ওকে বিয়ে করা উচিত ?
খুব সাদামাঠাভাবে বললাম, কারণ তুই ওর প্রেমে পড়েছিস এবং সম্ভবত, ওকে বিয়েও করতে চাস।
বাপী খাবার আর কফির কাপ-ডিশ পাশে সরিয়ে একটা 'ক্যামেল' সিগারেট ধরাল। একটা আমায় দিয়ে বলল, নে ! তারপর ব্রেকফাস্টের দাম ও টিপ্‌স টেবিলে গুছিয়ে রেখে বলল, চল, মাদারল্যাণ্ড অ্যাভেনিউতে বাবলির ফ্ল্যাটে একবার যাই।
আমি 'হ্যাঁ', 'না' কিছুই বললাম না, কারণ এত সবের পর বাবলিকে স্পষ্ট করে দেখার উদগ্র বাসনা হচ্ছিল। কীরকম বাসনা হচ্ছিল ওর নিজের মুখে ওর সমস্যাগুলো শুনি। দেখি পুরাতন প্রেম কীভাবে টিকেবর্তে আছে ওই একরত্তি মেয়ের মধ্যে। কতই বা আর বয়স ? টেনেটুনে ঊনিশ-কুড়ি।
রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাপী বলল, তুই কিন্তু আমার হয়ে কিছু বলিসনি ওকে। জানি না, কী ভাবতে কী ভেবে বসে। আমি ওকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, আমি আদৌ সেই গাড়োল নই, বাপী মহাশয় !
বাপী অপ্রস্তুত হয়ে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, ধর্।
সাদারল্যাণ্ড অ্যাভেনিউয়ের ওপর ফ্ল্যাটটা নীলুর দাদা সন্তুর। লণ্ডনের অটোমোবিল অ্যাসোসিয়েশন, সংক্ষেপে 'ডবল-এ'-তে ডে অ্যাণ্ড নাইট শিফটে কাজ করে সন্তু। প্রধানত নাইট শিফটেই।

দিনে লিঙ্কনজ্ ইন-এ আইন পড়ে। ‘কদিন হল বাবলি ওখানে এসেই থাকছে’, বলল বাপী। তারপর একটু রহস্য করে যোগ করল ‘ভাস্বর ঠাকুরের আশ্রয়ে।’ কিন্তু আমার হাসি পেল না। আমি নীরবে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বাপীর পাশাপাশি হাঁটছি। সন্তুর এই ফ্ল্যাটটা বাস্তবিকই গর্জাস। বার কয়েক আমি আর বাপী এখানে পার্টি করতে এসেছি। মস্ত মস্ত ঘর, ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে বাগানের থেকে আলাদা করা। ফ্ল্যাটের দুখানা বড় ঘর নিয়ে থাকে সন্তু, বাকি দুখানায় একটা ইংরেজ যুবতী। লম্বা চওড়া সুন্দরী মেয়ে, নাইটক্লাবে নাচে। এবং দেখেশুনে মনে হয়, ফাঁকা সময়ে সন্তুকেও নাচায়। সন্তুর খুব ঝোঁক ওর ওপর, কিন্তু বিশেষ এগোতে পারে না সিলভিয়ার ক্যারিবিয়ান প্রেমিকের ভয়ে। সে এক ছ’ফুট সাত ইঞ্চি কৃষ্ণাঙ্গ পপ সিঙ্গার। মাল খেয়ে থাকলে সিলভিয়াকেও দু’চার ঘা বসিয়ে দেয় মর্জি মতো। সন্তু ওর প্রেমিকার দিকে হাত বাড়াচ্ছে জানলে জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে বাঙালিনন্দনকে।

সন্তুর ফ্ল্যাটে বেল টিপতে টিপতে বাপী বলল, এখনও সন্তুর নাইট ডিউটি করে ফেরার সময় হয়নি। বাবলি একাই থাকবে। কথা বলতে সুবিধেই হবে।

কিন্তু বেল-এ সাড়া নেই। বাপী ফের বেল টিপল। তারপর আবার। চতুর্থবার যখন টিপতে যাবে তখন কুট করে আওয়াজ হয়ে দরজা খুলে গেল। আর দরজা খুলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে শোয়ার পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে নীলু।

সিলভিয়ার প্রেমিক সেই কালো দৈত্যটাকে দেখলেও আমরা এর চেয়ে বেশী অবাক হতে পারতাম না। বাপী বা আমি দুজনেই এত বোকা বনে গেছি যে মুখে কোনও হাসি বা কথা জোগাচ্ছে না। প্রিয়, পরিচিত ছেলেটাকে দেখে আমাদের কোনও প্রতি-ক্রিয়াই প্রায় হচ্ছে না।

শেষে নীলুই বরফ ভাঙল, কী, কেমন আছ তোমরা ?

সামাল দেবার জন্য বাপী বলল, কী, সন্তু ফেরেনি এখনও ?

আমাদের ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকিয়ে নিতে নিতে নীলু বলল, সময়

হয়ে গেছে। যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বে। ততক্ষণ তোমরা একটু কফি খাও।
আমরা কেউ আপত্তি করলাম না।
নীলু আমাদের নিয়ে বসালো প্রথম ঘরটায়। যেখানে একটা বত্রিশ-চৌত্রিশ বছরের ভদ্র চেহারার ইংরেজ লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। নীলু বলল, দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড, টিচার অ্যান্ড লাভার জিম। অ্যান্ড দিজ আর মাই গ্রেট·ফ্রেন্ডস বাপী অ্যান্ড নীতিন।
একটু চোখ পিটপিট করে ঘরের আলোটা চোখে সইয়ে নিয়ে তড়াক করে বিছানার ওপর হাঁটু মুড়ে বসল জিম। আর আমাদের দুজনের দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, হাই ?
কাল রাতেই এই ব্যাটাকে পেঁদাবার কথা বলছিল বাপী। লোকটার চেহারা-চরিত্র দেখে বোধহয় ওর সেই রাগ গলে জল হয়ে গেছে। প্রায় ইতস্তত না করেই ও ডান হাত বাড়িয়ে ধরে নিল ওর হাত। আর ঝাঁকাতে থাকল। তারপর আমার পালা। হাত ঝাঁকালাম আমিও। তারপর কোনও মতে পায়জামার ঢিলে দড়িটা টাইট করতে করতে টলমল পায়ে বিছানা থেকে মেঝের কার্পেটে নামল জিম।
কিছুটা সৌজন্য রক্ষার জন্যই আমি আর বাপী 'এক্সকিউজ মি' গোছের কিছু বলতে বলতে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আমাদের দুজনেরই ইচ্ছে বাবলির ঘরে গিয়ে বসি।
বেরিয়ে করিডোর দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়ার পথে···হ্যাঁ, ওই তো বাবলি। একটা ঢিলেঢালা নাইটিতে কোনও মতে নিজের নগ্নতাকে ঢেকে টয়লেটের দিকে ত্রস্ত পায়ে এগোচ্ছে। আমাদের দেখে এক দণ্ড থামল, প্রায় অনাবৃত বুকটাকে টেনেটুনে ঢেকে কঠিন, হিংস্র চোখে আমাদের দিকে চাইল। মুখে অস্ফুটে বলল, ও ! তোমরা। তারপর ঢুকে গেল বাথরুমে। আমরা বুঝতে পারছি না এরপর আর আমাদের এগোনো উচিত কিনা। কিন্তু বাপী সাপুড়ের বাঁশিতে ধরা সাপের মতো এগিয়েই চলল বাবলির ঘরের দিকে। সঙ্গে আমিও।
এবার আরেক সাহেব লাফ দিয়ে উঠল বিছানা থেকে। বলল, আই অ্যাম অ্যান্ডি। জিমস ফ্রেন্ড। নাও বাবলিজ্ ফ্রেন্ড টু।

দুটো রোবটের মতো বাপী আর আমি হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলাম ওর সঙ্গে। একজন বললাম, 'আই অ্যাম নীতিন', আরেকজন 'আই অ্যাম বাপী'। এ সাহেবও দেখি পায়জামার গিঁট সামলাতে সামলাতে কার্পেটে নামছে। আর আমি আর বাপী ভাবছি এবার পালিয়ে কোথায় ঢুকব।
এবার পিছন থেকে দৌড়ে এলো নীলু।—কী হে, তোমরা পায়ে পায়ে ঘুরছ কেন? বসো। এখানেই বসো। অ্যাণ্ডি ইজ আ গ্রেট ফ্রেণ্ড অফ আওয়ার্স। হি হ্যাজ ফলেন হেড ওভার হিলজ ফর বাবলি। দে উইল মেক আ ফাইন কাপল্!
রাগে-জ্বলে যাচ্ছে আমার গোটা শরীর বাস্টার্ডটার কথায়। বাপী আঙুল মটকাতে শুরু করেছে। সেটা ওর রাগ চড়ার লক্ষণ। অবস্থা গুরুতর হতে পারে দেখে আমি বাপীর পিঠে হাত রেখে বললাম, চল, বাইরে বাগানে গিয়ে বসি। বাপী কিছু বলার আগে পিছন থেকে বলে উঠল বাবলি, না, প্লিজ। তোমরা আমার ঘরেই বসো।
ঘরে দেখি একটা আকাশী নীল ড্রেসিং গাউন পরে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে বাবলি। একটু আগের সেই রাগী চেহারাটা কোথায় মিলিয়ে গেছে। এক অদ্ভুত প্রশান্তি এখন খেলা করছে ওর ওই সুন্দর মুখে। ও যেন আরও সুন্দরী হয়েছে।
আমি এক মনে ওকে দেখতে দেখতে গিয়ে ঘরের সোফাটায় বসলাম। বাপীও এসে বসল। 'আই উইল গো ড্রেস আপ মাইসেল্ফ' বলে অত্যন্ত সুদর্শন সাহেবটা ঘরের বাইরে চলে গেল। ওর দিকে আল্‌তো ভাবে দৃষ্টি ফেলে বাবলি বলল, অ্যামেরিকান ছেলে। জিমের বন্ধু, ডাক্তার। কালই পরিচয় হল।
আমরা কেউ কিছু বললাম না উত্তরে। এই অ্যাণ্ডি সম্পর্কে আমাদের দুজনের কারোওই কোনও কৌতূহল নেই। কিছুক্ষণের নীরবতার পর না-রাগ, না-অভিমান, না-আনন্দ, না-দুঃখ এমন একটা মনোভাবে বাবলি বলল, লাস্ট নাইট উই স্লেপ্ট টুগেদার। আমি ওর সঙ্গে শুয়েছি।
আমাদের পক্ষে কোনও শব্দ করারও জো নেই। আমরা শুধু

বাবলিকে দেখছি। আস্তে আস্তে কীরকম পাথরের মত হয়ে যাচ্ছে বাবলি। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটার দিকে স্থির তাকিয়ে বলছে, জিম ভাল ব্যবসা করেছে। আমার নীলুকে কেড়ে নিয়ে অ্যাণ্ডি তুলে দিয়েছে। স্ট্রং, হ্যাণ্ডসাম, অ্যামেরিকান ইয়ুথ। আই শুড বি হ্যাপি। আমার কী সৌভাগ্য নীতিনদা।

আর থাকতে পারছি না ঘরে। গলার কাছে মোচড়াচ্ছে কীরকম। বাবলি দু'হাতে চোখ ঢেকেছে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল গড়াচ্ছে। নীল কার্পেটের ওপর দৃষ্টি এঁটে মনোরোগীদের কায়দায় আপন মনে বিড়বিড় করে কী সব বলে যাচ্ছে বাপী। আমি একটা বড় স্টেপে ঘরের বাইরে গিয়ে টয়লেটটা খালি পেয়ে ওখানেই ঢুকে গেলাম। পিছনে দরজা টেনে দিয়ে দোনামনায় পড়লাম। এই ছোট্ট এক চিলতে টয়লেটে দাঁড়িয়ে আমার কী উপকার হবে? তার চেয়ে…

আমি পাশ ঘুরতেই বেসিনের আয়নাটাকে সামনে পেলাম। আর আয়নার মধ্যে নিজেকে। আর, আর আমার চোখে জল। গণ্ডদেশ দিয়ে গড়াচ্ছে। কেন? কার জন্যে? কতটুকু?

আমি দেখছি আমি কাঁদছি। বাপী কাঁদতেও পারেনা, তাই বোবা মেরে বসে আছে বাবলির সামনে। বাবলিও কাঁদছে, কিন্তু ও চায় না আমরা দেখি। আমি চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসছি টয়লেট থেকে, ফের আয়নার একটা অংশে চোখ গেল। লাল লাল দাগ কীসব। আমি কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। লাল লিপস্টিকে আঁচড় কাটা। নিশ্চয়ই বাবলির। কিন্তু কার জন্য? আমি আরও ঘনিষ্ট হলাম আয়নার। আর স্পষ্ট দেখছি—

ফেয়ারওয়েল নীলু! আই স্টিল লাভ ইউ।'

ভেতরে কীরকম প্রতিরোধ হচ্ছে একটা। নীলু, নীলু, নীলু। পাষণ্ড, বাস্টার্ড, সোয়াইন। ও কোনদিনও বুঝবে না ভালবাসা কী। ও কোনদিন বুঝবে না বাবলিই বা কী। শুধু ভালবাসার জন্যই ভালবেসে-বেসে মরে যাবে মেয়েটা।

আমি পকেটের রুমাল বার করে আয়নার লেখাগুলো ঘষে ঘষে মুছতে লাগলাম। নীলুর প্রাপ্য নয় এই ভালবাসা।

১০ নং মিণ্টো লেন

১০ নং মিণ্টো লেন কপালের ওপর ঝুলে থাকা চুলের গোছার মতো। হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেও হঠাৎ কখন জায়গা মতন নেমে আসবে। ভুরু ঠেলে ওপরে চাইবার প্রয়োজন নেই, কপালই জানান দেয় সেখানে চুল পড়েছে।

১০ নং মিণ্টো লেন গলির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচতলার এক পুরনো, লাল-ইটের ম্যানসন। কয়েক যুগ ধরে এজমালি সম্পত্তি। পাঁচতলা জুড়ে পনেরোটা ফ্ল্যাটেই ভাড়া বসানো। কিন্তু কে কাকে ভাড়া দেয় কেউ জানে না, ভাড়াটেরাই জানে না পাশের ফ্ল্যাটের মালিকানা কার। তাদের অনেকেরই মনে নেই শেষ কবে ভাড়া গুনেছে।

১০ নং মিণ্টো লেনের পাঁচ তলার ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙ্গের বারান্দাটাই কপালের ওপর ঝুলে থাকা চুলের গোছার মতো। ওই বারান্দার পাশে আরও যে কতকগুলো একই চেহারার বারান্দা আছে, তার নিচে যে আরও চার-চারটে তলা আছে তা চোখে ধরা দেয় না।

১০ নং মিণ্টো লেনের সমস্ত সত্তা মুছে গিয়ে একটা ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙ্গের বারান্দা হয়ে আছে। সাত-সাতটা বছর। যবে থেকে ডিকির বৌ হয়ে এসে দুপুরে, সন্ধেয় বারান্দায় এসে দাঁড়ানো শুরু করল শীলা। লাল কিংবা তুঁতে শাড়িতে জড়ানো এক ঝলক সূর্যরশ্মিই যেন। কখনও পান কখনও লিপস্টিকে এমন লাল ঠোঁট যেন স্টেজে দাঁড়ানো নায়িকা। এক রত্তি গোল, ফুলদানি রেলিঙ্গের বারান্দার স্টেজে দাঁড়ানো নায়িকা।

আর পাড়ার সমস্ত উঠতি যুবক যার দর্শক, যার ফ্যান।

গত সাত-সাতটা বছর নীতিন গলির রাস্তাটুকু হেঁটে পার করতে পারেনি একবার অন্তত ওই কপালের ওপর ঝুলে থাকা চুলের মতো ওই বারান্দার দিকে এক ঝলক না তাকিয়ে। রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে কতবারই না মনে হয়েছে পাড়ায় আর একটিও বাড়ি, একটিও দরজা, একটিও জানলা নেই। আছে শুধু একটা বারান্দা, আর তার ওপর একটা থির বিজুরি রক্তমাংসে বাঁধা।
সাত বছর আগে স্কুলে যাওয়ার পথে নীতিন প্রথম দেখে দৃশ্যটা। হয়তো সেদিন পরীক্ষা ছিল, তাই বেশ হড়বড়িয়েই হাঁটছিল নীতিন ট্রামরাস্তার দিকে। খান তিনেক ফাউন্টেন পেনের ভারে বাঁ দিকের বুক পকেট হেলে পড়েছে, ডান হাতে খান চারেক মোটাসোটা বই। একটা মুখস্থ করা উত্তরের শুরুর বাক্যটাই হয়তো মনে মনে রগড়াচ্ছিল, ফলে চোখ ছিল চিন্তার ভারে মাটির দিকেই। যখন কোত্থেকে এক ফোঁটা জল এসে পড়ল চশমার কাচে।
কাচের ওপর ঝাপ্‌সা ফোঁটাটা যে জল তা প্রথমে বুঝতেই পারেনি নীতিন। ও দেখল বাঁ চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে। নাকি ডান চোখের? না দু' চোখেরই? ও কী হয়েছে বুঝতে মাটির থেকে চোখ তুলে আকাশের দিকে চাইল। অমনি আরও কয়েকটা ফোঁটা হাওয়ায় উড়ে এসে চশমার দুই কাচে পড়ল। আর তখন নীতিনের প্রথম খেয়াল হল যে আকাশে মেঘ করেছে, নীলচে অন্ধকার একটা ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশে, বেশ জোরে হাওয়া বইছে আর বৃষ্টির উড়ো ফোঁটাও ঝরছে এখানে-ওখানে।
আর ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে ঝাপসা চশমা দিয়েই নীতিন দেখে ফেলল ১০ নং মিন্টো লেনের ছোট্ট, গোল বারান্দায় লাল শাড়ি বিদ্যুৎটিকে।
পাড়ার সব ছেলের মতো নীতিনেরও হিসেব আছে পাড়ার কোন্ বাড়ির কোন্ বারান্দায় কোন্ মেয়ে দাঁড়ায়। আর সকলের মতো নীতিনেরও ছকা আছে কোন্ বারান্দায় কার দাঁড়াবার সময়টা কী। ১০ নং মিন্টো লেনের ওই বারান্দায় কোনও মেয়ে দাঁড়ায়নি কোন-দিন। ওটা মস্তান ডিকি গোমেসের বারান্দা, যেখান থেকে কচিৎ কখনো মাঝরাত্তিরে মাতালের হুঙ্কার শোনা যায়। কখনো সখনো,

মাতালদের কোরাস গান। যখন সারা পাড়া টের পায় জাহাজের মসালচি ডিকি গোমেস মোটা কামিয়ে মাস দুয়েকের মতন ডাঙার বাসিন্দা হল।

নীতিন ভাবল, মেয়েটি কি তাহলে ডিকিদা'র বৌ? ভেবেই চমকে উঠল ভেতর ভেতর। ডিকিদা' ডাঙায় থাকে গড়ে চার মাস, যার দু'মাস যায় পার্টি করে, ফুর্তি করে, পয়সা উড়িয়ে। বাকি দু'মাস যত্রতত্র ধারকর্জ করে। দু'মাস স্যুট-বুটে দুরন্ত ভাবে, দু মাস নোংরা, আকাচা জামায় মদো মাতাল চেহারায়। দু'মাস ডিকি মস্তান পাড়া শাসন করে, উঠতি রুস্তমদের চড়-চাপ্টা টিকটাক মেরে শির করে রেখে, অন্য দু'মাস ওদেরই পয়সায় বাংলা চোলাই, কাঁচি-ক্যাপস্টান খেয়ে। গলাগলি করে রোয়াকে বসে।

ধুর! ও লোকের ও বৌ হয় না—নিজের মনে জোরে জোরে বলতে বলতে নীতিন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েও ফের তাকাল পাঁচতলার ওই বারান্দার দিকে। রক্তমাংসে বাঁধা বিদ্যুৎটিও কখন জানি গোল বারান্দার গোল রেলিঙ্গ ধরে ঘুরে গেছে ট্রামরাস্তার দিকে। আর, ঝাপ্সা কাচেও নীতিন আবছা ভাবে দেখল শাড়িজড়ানো বিদ্যুৎ নিচে তাকিয়ে ওর দিকেই!

এরপর হয় বৃষ্টির আশঙ্কায় নয়তো জীবনের প্রথম এরকম সঙ্কোচে নীতিন প্রায় দৌড়তে থাকল ট্রামের জন্য।

সন্ধেবেলায় পাড়ার রোয়াকে বসতেই ভুল শুধরে গেল নীতিনের। লাল-শাড়ি বিদ্যুৎ বাস্তবিকই ডিকির নবপরিণীতা স্ত্রী। 'মাইরি!' বলে অ্যাৎকে উঠেছিল নীতিন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কিছুটা নিশ্চিন্তও হয়েছিল। মহিলাকে তাহলে মাঝেমধ্যেই আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখা যাবে। পাড়ার একটা প্রকৃত কালেকশান হল তাহলে।

পরদিন স্কুলের পথে ফের ওপরে তাকাল নীতিন। কিন্তু বারান্দা খালি। যাচ্চলে! এর কি বারান্দায় দাঁড়ানোর কোনও নিয়মকানুন নেই? কিছুটা পথ পেরিয়ে ফের মাথা ঘোরালো নীতিন। শুধু থমথমে মেঘ দেখল আকাশে; আকাশে বা বারান্দায় কোথাও কোনও বিদ্যুৎ নেই।

সাত-সাতটা বছর কিন্তু খুব কম সময় না—ভাবল নীতিন। এর মধ্যে চার-চারটে রছর ডাক্তারি পড়া হয়েছে। নারী ও পুরুষের অ্যানাটমি সম্পর্কে কত জ্ঞান বেড়েছে নীতিনের। সহপাঠিনী কুমকুমের ঠোঁটের চুম্বন পেয়েছে, শরীরের ঘ্রাণ পেয়েছে, স্পর্শ করেছে ওর নরম, সাদা ত্বক। চোখের সামনে দেখেছে ডিকি জাহাজের ডিউটিতে জয়েন করলে বন্ধু সুবিমল, কাতু, রঞ্জিত, সুজয়, টমি, অ্যান্হনি, রবিন নিয়মিত যাতায়াত করছে পাঁচতলার ওই রোমাঞ্চকর ফ্ল্যাটে। হয়তো রবিনই প্রথম বলেছিল চার্মিনার ধরিয়ে ইডেনের ঘাসে শুয়ে, অসাধারণ মেয়েছেলে রে! তুলনা হয় না। একেবারে পার্ফেক্ট নিমফোমেনিয়াক।

কড়াৎ করে বাজের মতো কথাটা এসে বুকে আছড়ে শিরা, রক্তনালী ফুঁড়ে পেটের মধ্যিখানে কোথাও এসে দপাতে লাগল। নীতিন বুঝল ওর পেটের মাঝখানটা লাফাচ্ছে। ভয়ে, লজ্জায়, সম্পূর্ণ হতাশায়। ওর গলার আওয়াজ ধরে গেল। ও বলতে চাইল 'সত্যি?' কিন্তু গলা ভেঙ্গে গেল। মেয়েটা নয়, ওর ঘৃণা হল রবিনের প্রতি। কাঁপা কাঁপা হাতে চার্মিনার ধরাতে গিয়ে চোখে একটু যেন ঝাপসাই দেখল। আকাশের দিকে মুখ তুলে বুঝতে গেল কাচে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল কি না। কিন্তু কোথাও বৃষ্টির চিহ্নই দেখল না।

এরপর কোনও একদিন হয়তো অ্যান্হনি বলেছিল, কিংবা সুবিমল, কিংবা সুজয়, কিংবা···কী এসে যায় কে সেটা? কিন্তু কেউ একজন ছবি বর্ণনা করার মতো করে বর্ণনা করেছিল শীলার শরীর। সোনালি তামাকের রঙের টানটান, চাবুক শরীর। কিছুটা রোমশও, আবার তা সত্ত্বেও মসৃণ। বড় উষ্ণ শরীরও, একটা পর্যায়ে নদীর মতো ঘামে। তখন চোখ দুটো এত বড় হয় যেন মানুষের চোখের কোটরে বাঘিনীর আইবল্। তখন কপালের টিপটাও যেন শুক্ল পক্ষের চাঁদের মতো ফড়ফড় করে বাড়তে থাকে। আর বুকের···

নীতিন আর শুনে উঠতে পারেনি বাকিটুকু। হঠাৎ বাথরুম করতে যাওয়ার বাহানায় উঠে গেছে। তারপর পাড়ার বারোয়ারি টয়লেট ফণীদার গ্যারেজের পাশের দেওয়ালের সামনে অকারণ থুম্ হয়ে

দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল এইমাত্র শোনা কথাগুলোর মানে নিয়ে। আসলে নিজের মনে দেখতে লাগল সোনালি তামাকের রঙের শরীরটাকে। যার সঙ্গে ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দায় দাঁড়ানো শরীরটাকে মেলানো বেশ কঠিন। একই শরীর, অথচ পরিবেশ ও স্থানবিশেষে কত আলাদা! বহুক্ষণ এভাবে দেওয়াল-মুখো হয়ে দাঁড়িয়ে শেষে বাড়ি চলে গেল নীতিন।

আর সে-রাতেই প্রথম আধা ঘুম, আধা জাগরণে শীলাকে দেখল নীতিন। ওর মনে হল ওর বন্ধুরা শুধু ডিকি গোমেসকেই নয়, ওকেও ঠকিয়েছে। এক মূর্খের পায়ের তলায় তো হামেশাই কোনও জমি নেই, শুধু জল; আরেক মূর্খের মাথার ওপর কোনও ছাদ নেই, মেঘ নেই, আকাশ নেই, শুধু একটা বারান্দা।

মেডিকালের ছাত্র হবার প্রথম দিনগুলোর উত্তেজনায় বন্ধুদের মনে মনে ক্ষমা করে দিল নীতিন। ওর তখন বেশ কিছু সহপাঠিনী। কারও শাড়ি, কারও সালোয়ার-কামিজ, কাবও লং স্কার্ট ওর ভাল লাগে; কারও হাসি, কাবও রাগী, গোমড়া মুখ, কারও ফ্যাল-ফেলে চাউনি ওর চোখ টানে। কিন্তু সন্ধেকালে রোয়াকে বসে ওর শোনা চাই রবিন নয়তো সুজয় নয়তো টমির মুখে শীলার কথা, শীলার বর্ণনা। কোনদিন দুপুরে কাকে ভুনা কারি রেঁধে খাইয়েছে, কাকে পর্ক বিন্ধালু খাওয়ানোর কথা দিয়েছে, কাকে চুরি করে খাইয়েছে ডিকির আনা স্কচের বোতল থেকে এক পেগ জনি ওয়াকার। এরা সবাই এখন ডিকির ন্যাওটা। মস্তান ডিকি এখন ঘুষোঘুষি কমিয়ে পাড়ার এই সব কলেজ-করা ছেলেদের সঙ্গে সময় কাটায়। জাহাজ থেকে ফিরে পার্টি জমায় এদের সঙ্গে। মাল টেনে বারোদুয়ারিতে বেহুঁশ হয়ে পড়লে এরাই কাঁধে করে তুলে দিয়ে যায় পাঁচতলার আস্তানায়। টানটান করে শুইয়ে দেয় বিছানায়। তখন চোখবোজা ডিকি টিপিকাল সাহেবি অ্যাকসেন্টে বলে দেয়, থ্যাংক ইউ ব্রাদার, থ্যাংক ইউ।

নীতিন বুঝেছিল জাহাজি ডিকির পক্ষে শীলার ওপর বারোমাসি দখল রাখা অসম্ভব। ডিকি নিজেও জানত যে ও আসলে একজন পার্টটাইম স্বামী। খোলসা করে বলতে গেলে—একজন সুদর্শন,

স্বাস্থ্যবান পার্টটাইম স্বামী।
এই ডিকিদা' কাল বলতে গেলে জোর করে নীতিনকে টেনে নিয়ে এসেছিল ওর রোমাঞ্চকর ফ্ল্যাটে। সদ্য জাপান ট্যুর করে ফিরেছে জাহাজ। ডিকিদা'র পকেটভর্তি লাকি স্ট্রাইক সিগারেট। গায়ের র‍্যাংলার জ্যাকেটে উগ্র সেন্টের গন্ধ। মুখে হুইস্কির সোঁদা ঘ্রাণ। বোঝাই যায় ট্রিপের টাকা এখন উথলে উঠছে পকেটে। তবু শেষ বারের মতো মিনতি করল নীতিন, ডিকিদা', থাক না! আরেক দিন হবে খন।
হাত ছাড়েনি ডিকি। কব্জিতে এখনও দেদার জোর। চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, আর কবে হবে নীতু? দেখছ না কত পাক ধরেছে চুলে? দাড়িও পেকেছে। একদিনও তো বৌদির সঙ্গে দেখা করতে এলে না। জানি ডাক্তার হচ্ছ শিগগির, তা বলে মুখ্যু দাদাদের ভুলে যাবে? তোমাকে লাটাই ধরে ঘুড়ি ওড়াতে শিখিয়েছিল কে?
হে ভগবান, তাই তো! নীতিনের মনে পড়ল কবেকার সেই দিনগুলো। লাহাদের বড় ছাদে লাটাই ধরে ঘুড়ি ওড়ানোর হাতেখড়ি হয়েছিল এই ডিকিদা'র কাছেই। তখন চশমা হয়নি নীতিনের, কাচে জল লাগার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ঘুড়ি উড়িয়ে একাগ্র চিত্তে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যাসেরও শুরু নেই। তার অনেক দিন পর একবার চশমায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে ওপরে চেয়ে এক নতুন খেলা শিখল নীতিন। গত সাত বছরে ফলে আর বিশেষ একটা বারান্দার দিকে নজর না তুলে ওর কিছুতেই মিন্টো লেন পার হওয়া হয় না।
সেই থেকে কপালের ওপর এক গোছা চুলের মতো ঝুলে আছে একটা বারান্দা।
নীতিন ডিকির পিছন পিছন উঠে গিয়েছিল ১০ নং মিন্টো লেনের পাঁচতলার ওই ফ্ল্যাটে।
গতকাল খুব দূরের ঘটনা নয়—নীতিন ভাবল একবার মনে মনে। খুব স্কচ খাইয়েছিল ডিকিদা', কিন্তু সন্ধেটা মন থেকে মুছে যায়নি। ওর গেলাসে মদ দিতে দিতে বলেছিল ডিকি, দিস ইজ জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল, নট রেড। এর জাতই আলাদা।

মদে ঢোক দিতে দিতে এক নজরে নীতিন দেখছিল শীলাকে। কে বলবে সাত-সাতটা বছর কেটে গেছে এর মধ্যে! তিন তিনটে মিস-ক্যারেজ হয়েছে। ফলে মহিলা এখনও মা হননি। তার বেদনা কি কোথাও বাসা বেঁধেছে মুখে? নীতিনের ডাক্তারি চোখ কিছুই খুঁজে পেল না।

হঠাৎ নীতিনের প্লেটে কাবাব ঢালতে ঢালতে ডিকি বলল, জানো নীতু, আজ আমার বৌয়ের জন্মদিন! শি ইজ থার্টি টুডে। কিন্তু আমি শালা তোমার বন্ধুদের কাউকে ইনভাইট করিনি। ওরা সবাই বিট্রেয়ার। কেউ আমার পাশে দাঁড়ায়নি কখনো। শুধু পার্টি করতে এসেছে যখন আমি মোটা মোটা ক্যাশ নিয়ে এসেছি। যখন ফের জাহাজে গেছি সব শালা সুখের পায়রা উড়ে গেছে যার যেখানে খুশি। তোমার বৌদির কোনও সুবিধে-অসুবিধে কেউ আসেনি দেখতে। শালা…

একটা কাবাবের টুকরো গোটা গোটাই সেঁধিয়ে যাচ্ছিল নীতিনের কণ্ঠনালীতে। ডিকিদা'র অনুপস্থিতিতে কেউ আসেনি মানে! তখনই তো আসল মোচ্ছব চলত এ বাড়িতে। নীতিন প্লেট থেকে চোখ তুলে চাইল শীলার দিকে। দেখল শীলাও সেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছে ওকে। ওর যে দৃষ্টি প্রথম দেখেছিল সাত বছর আগের মেঘলা সকালে।

শীলার হাতে স্কচের গেলাস। কিন্তু আসল মদটা ওর চোখে। নীতিন চোখ নামিয়ে নিল। ডিকি ফের ওর গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলল, তুমি বড্ড স্লো যাচ্ছ ব্রাদার কুইক! কুইক! শীলার জন্মদিন আজ, আজ বটমজ আপ হতেই হবে।

বটমজ্ আপই হল। কিন্তু মেঝেতেই ফ্ল্যাট হয়ে পড়ল ডিকি। বোতলের সত্তর ভাগ একাই ধ্বংস করার সাক্ষাৎ প্রতিফল। ওকে ধরাধরি করে বিছানায় নিয়ে ফেলল শীলা আর নীতিন। স্বামীকে শোয়ানোর পর কী ভেবেই যেন ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়াল শীলা। বোধ হয় রাতের আকাশের তারা দেখতে।

একটু পর ওর পিছনে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়াল নীতিন। শুনল

ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই বলছে শীলা, কাল দুপুরে একবারটি আসবে এখানে ? অসুবিধে হবে ?
অনেক দিন পর ফের গলা ভেঙ্গে গেল নীতিনের ছোট্ট বাক্যটা বলতে, না, না, আসব। কোনও অসুবিধে নেই।
সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সাতটা বছরকে মাত্র সাতটা দিনের মতো ধরে ফেলতে পারছে নীতিন। আবার সবই কীরকম ফস্কে ফস্কেও যাচ্ছে। আসল বস্তুটি যত কাছে আসছে স্মৃতিগুলো চশমার কাচে বৃষ্টির ফোঁটার মতো হয়ে পড়ছে। নীতিন কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে গেল। নিশ্চয়ই ওর আসার ওপর বারান্দা থেকে নজর রেখেছে শীলা। হে ভগবান, শেষে এই দিনটাতেই ও চোখ তুলে এই কপালের ওপর চুলের গোছার মতো ঝুলে থাকা বারান্দাটাকে দেখতে ভুলে গেল!
শীলার পরনে কি সেই প্রথম দিনের লাল শাড়ি ? অতশত বুঝতে পারল না নীতিন। শাড়ি নিয়ে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল।
শীলা বলল, সকালে মাথাটাথা ধরেনি তো ?
নীতিন লজ্জায় হেসে ফেলল, না ওরকম আমার হয়টয় না।
শীলা সম্ভবত ঠাট্টার ছলেই বলল, কী হয়টয় তোমার ?
বেশ ঝাঁঝের মাথায় নীতিন উত্তর করল, আমার কিছুই হয়না।
সবজান্তা ভাব করে শীলা বলল, তা আমি জানি। সাত সাতটা বছর দেখছি তো!
তার মানে ? তুমি আবার কী দেখলে ?
কেন, রাস্তা থেকে চোখ তুলে তুমিই শুধু দেখো। বারান্দা থেকে নিচে চেয়ে আমি কিছু দেখতে পাই না বুঝি ?
ও তাই! তা কী দেখতে পাও ?
গুমোর! বাবুর গুমোর!
গুমোর! নীতিন আকাশপাতাল হাতড়ে হদিশ পেল না ওর কোথায় কী গুমোর। কেনই বা! শীলার সঙ্গে ওর কী টক্কর। ও আস্তে আস্তে গিয়ে বসল একটা মচমচে বেতের সোফায়। আর বলল, তাহলে ডেকে এনে কেন একথা বলোনি আগে ?
ফোঁস করে উঠল সেই আদি অকৃত্রিম থির বিজুরি, কী বলিনি ?

রবিন, সঞ্জয়, টমি তোমায় বলেনি আমি ডেকেছি ?
মাথায় ওই গোল বারান্দাটাই ভেঙ্গে পড়েছে বোধ হয় নীতিনের। এতজনকে ডেকে খবর দিয়েছে, কিন্তু হারামিরা কেউ একটা জানায়নি ওকে ! এত নীচ ওই তথাকথিত ভদ্রলোকের ছেলেগুলো ? ওর তথাকথিত বন্ধুগুলো ?
কিন্তু মুখ দিয়ে নীতিনের বেরুলো, হ্যাঁ, তা বলেছিল। পরাস্ত কণ্ঠে শীলা বলল, তাই না শেষে দাদাকে দিয়ে পাকড়াও করে আনতে হল।
একটা হাল্কা রোমাঞ্চ বোধ করল নীতিন। ভেতরে ভেতরে কৃতজ্ঞ বোধ করল বন্ধুদের প্রতি। নাই বা খবর দিয়েছে! না হলে এভাবে, এই সমাদরে হয়তো আসা হতো না সোনালি তামাকের রঙের···নীতিন মনে মনে শীলার গোটা শরীরটা দেখতে শুরু করেছে। হোক না পরের বর্ণনায় জানা, কল্পনাটা তো নিজের ! চাইলেই তো এখন মিলিয়ে দেখা যায় বাস্তব আর কল্পনাকে। নীতিন বেতের সোফা ছেড়ে উঠে এসে বসল শীলার পাশে খাটে। হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরল। উহ্ কী উষ্ণ হাত। একটা মৃদু চাপ দিল হাতে। চাপটা ফিরিয়ে দিতে দিতে শীলা বলল, তুমি তো ডাক্তার। একটা উপকার করবে ?
কী উপকার বলো ?
কটা ইঞ্জেকশন দিয়ে যাবে এসে এসে কদিন ?
ইঞ্জেকশন ! কেন ? কী হয়েছে শীলার ? প্রশ্ন তো নয়, কতকগুলো চাপা উৎকণ্ঠা। যা মুখ গলে বেরোয় না।
শীলাই ফের বলল, তোমার দাদাই ধরে আনে রোগটা বাইরে বাইরে থেকে। আর আমায় দেয়। এই নিয়ে তিনবার হল। আমার আর ডাক্তারের কাছে যাবার মুখ নেই গো। গতবারই ওয়ার্নিং দিয়েছে এভাবে চললে বিশ্রী কিছু ঘটে যেতে পারে। কিন্তু ফের ধরেছে, লজ্জার কথা আমি কাকে বলব বলো তো ?
নীতিন শীলার হাত থেকে হাত তুলে নিয়ে খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কেন বলেছ তো একজনকে অন্তত। আমি কাল ওষুধ আর সিরিঞ্জ এনে ইঞ্জেকশন দিয়ে যাব তোমাকে। তবে তোমার

আগের প্রেসক্রিপশনটা পেলে ভাল হয়।
শীলা বলল, আছে। এই নাও। বলে ব্লাউজে হাত গলিয়ে বুকের ভেতর থেকে বার করে আনল একটা দলা পাকানো কাগজ। নীতিন বুঝল রবিন হোক সুজয় হোক টমি হোক বা সুবিমল ভুল বলেনি। যদিও কোনওই প্রমাণ নেই যে তারা বানিয়েও বলেনি। সুডৌল কুমারী স্তন শীলার, সোনালি তামাক রঙের ত্বকও কুমারীর মতো অবয়সি, আপন উষ্ণতায় ও স্বেদে ভিজিয়ে ফেলেছে কাগজের টুকরোটাকে।

আর এই হল হৃদয়ের নিভৃত ধন, আমার এশিয়াটিক লাভার—সদ্য ভেল্কি শেষ-করা জাদুকরের বিজয়ীর হাসি হেসে, ছোট্ট একটা 'বাও' করতে করতে কথাটা বললেন মিসেস ওয়ালশ। পর্দা সরানো জানালা দিয়ে দিনের শেষ আলো এসে পড়েছে চার ফুট বাই চার ফুট তেলরঙ ছবিটার ওপর। গোধূলির কমলা রঙ পড়েছে মিসেস ওয়ালশের ধবধবে সাদা, কোঁকড়া চুল আর মুখের ওপরও। শান্তনু বুঝতে পারল না মহিলার মুখটা অত রক্তিম গোধূলির আলোর জন্যই, না ওঁর ভেতরে এতক্ষণ ধরে গড়ে ওঠা অনুভূতির উত্তাপে। শান্তনু ওর তারিফ প্রকাশ করার আগেই মিসেস ওয়ালশ ছবির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্কুলের মেয়ের মতো সোহাগে হাত কচলাতে-কচলাতে ছবির মানুষটাকে দেখতে লাগলেন। শান্তনু বলতে গিয়েও বলে ফেলতে পারল না যে ছবিটা কোনও ভারতীয় যুবরাজের নয়, নিতান্তই একজন বাঙালি কবির, এবং সেই কবি যখন ব্রাইটনে বাস করেছেন তখন মিসেস ওয়ালশের জন্মানোর কথা নয়।

শান্তনু দু' পা এগিয়ে ছবির নিচে শিল্পীর নামটা দেখল। একটা সই—ফিটজিমন। পাশে ঝাপসাভাবে সন—পুরোটা পড়ার উপায় নেই। তারপর মুখ তুলে ছবির মানুষটার দিকে তাকাল। নির্ভুল ভাবে প্রথম যৌবনের রবীন্দ্রনাথ। প্রথম বারের মতো বিলেতে এসেছেন, সমুদ্রোপকূলবর্তী ব্রাইটন শহরে সাহেব পরিবারে থাকছেন, এখনও ঠিক নেই, তিনি শেষ অবধি কতখানি দেশি থাকবেন আর কতখানি বিলিতি হয়ে পড়বেন। ওই উজ্জ্বল, বিস্ময়ভরা চাহনিটাও বড় সুন্দর এনেছেন শিল্পী। সাহেবরা যাকে বলে পোলাইট ইগো তেমনও কিছু একটা যেন ফুটে বেরুচ্ছে ছবি থেকে। যুবক দেবেন ঠাকুরের পুত্র ততটা নয়, যতটা দ্বারকা-নাথের নাতি। গলাবন্ধ খয়েরি কোটটার সঙ্গে মানানসই করে হাতে

ধরা মোহ্যার লেদারে বাঁধানো, সোনালি এমবস করা বইটা। টাই-টেলটা ঝকঝক করে জানান দিচ্ছে যুবক রবির রুচি—কালেক্টেড ওয়ার্কস অফ পার্সিবিশ্ শেলি। শান্তনু এবার দু' কদম পিছিয়ে এসে মিসেস ওয়ালশের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ছবিটা। ছবির ওপরেই আস্তে আস্তে দিনের আলো মিলিয়ে যেতে দেখল দুজন।

সন্ধে নামল দেখে জানলার ব্লাইণ্ডস টেনে ঘরের আলো জ্বালতে গেলেন মিসেস ওয়ালশ। শান্তনু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, রাজকুমার কি খুব কবিতা ভালবাসতেন? হাতে শেলির বই দেখছি।

মহিলা মুখ ভেটকে আওয়াজ করলেন, পাপ্! বললেন, দূর! ওসব ওই আর্টিস্টদের আদিখ্যেতা। কারও ছবি আঁকলেই হাতে একটা বই গুঁজে দিত। ফর অল আই নো দ্য প্রিন্স নেভার কেয়ার্ড অ্যাবাউট পোয়েট্রি। ওর কবিতা ছিল নারী। হি কুড নট্ এভার টাচ মি উইদাউট হিজ ফিঙ্গার্স ট্রেমব্লিং লাইক লিভজ ইন অ্যান অটাম স্টর্ম! ও যখনই আমাকে ছুঁতো মনে হতো যেন শীতের সকালে ঝর্নার জল ছুঁড়ছে। হাতের ওর ওই কম্পন আসত প্যাশন থেকে। কখনো কখনো ওর প্যাশন ওকে গ্রাস করে ফেলত, ও আমাকে চুম্বন না করে দেওয়ালে দু হাত আর কপাল ঠেকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যেত। কিংবা ব্যালকনিতে বেরিয়ে গিয়ে সমুদ্রের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকত পাথরের মূর্তির মতো। আর তখন ওকে দেখে সদ্য যুবতী আমি কান্নায় ভেঙে পড়তাম। বলতে-বলতে বৃদ্ধা মার্লিন ওয়ালশ দু হাতে চোখ ঢেকে সোফায় বসে পড়লেন। শান্তনু হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে নিভিয়ে দুমড়ে দিয়ে ওঁর পিঠে হাত বুলোতে লাগল ছদ্ম সহানুভূতিতে। মুখে বলল, না মিসেস ওয়ালশ, এভাবে ভেঙে পড়বেন না। আপনার এশিয় প্রেমিককে দেখুন, কি দৃপ্ত, পুরুষালি! ও অবাক হবে আপনাকে এত সেণ্টিমেণ্টাল হতে দেখলে!

শান্তনু পকেট থেকে রুমাল বার করে ওঁর হাতে দিল। মিসেস ওয়ালশ সেটা টুক টুক করে চোখে ছোঁয়ালেন। একটু নাক

টানলেন। তারপর বললেন, তুমি ঠিক বলেছ, চ্যাটার্জি। আমি কাঁদলে ও ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ত। শান্তনু বিস্ময়ের ভণিতা করে বলল, তাই ? নার্ভাস হলে কী করত ? ড্রিঙ্ক ?
রীতিমতো শিউরে উঠে বৃদ্ধা বললেন, ওহ্ নো ! ড্রিঙ্ক করলে তো ভালই ছিল। ও এই একতলা থেকে তিনতলা ছুটে উঠত আর ছুটে নামত। সমানে। যতক্ষণ না দম বেরিয়ে যায়। তারপর দম ফুরোলে এই কার্পেটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠত। আমার স্বামীই তখন ওকে ব্র্যান্ডি-ট্যান্ডি দিয়ে সামলে নিত।
আপনার স্বামী !—এবার শান্তনু বাস্তবিকই অবাক হয়েছে। কী বললেন মিসেস ওয়ালশ, আপনার স্বামী ? আপনার স্বামী থাকতেই প্রিন্স আপনার প্রেমিক হল ?
মিসেস ওয়ালশ শান্তভাবে সংক্ষেপে বললেন, হ্যাঁ। তারপর একটু থেমে বললেন, ইটস্ স্ট্রেঞ্জ যে তুমি এখনও বুঝতে পারোনি আমি একজন পেন্টারের বউ। প্রিন্সের ওই একটা ছবি ছাড়া এ বাড়ির সব ছবি আমার স্বামীর আঁকা।
হেনরিই রাজকুমারকে একদিন ধরে এনেছিল ওর মুখ আঁকবে বলে।
তারপর ?
তারপর তিন দিন সিটিং করানোর পর শূন্যে হাত ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ইমপসিবল ! আই কান্ট ড্র হিম। হিজ ফেস ইজ লাইক আ গডস্ ফেস। ইট চেঞ্জেজ এভরি মোমেন্ট।
তখন ?
তখন আমি বললাম, যদি ওর মুখ ঈশ্বরের মতো হয় তো আমি ওকে মানুষ বানাব। বলে টুলে মাথা নিচু করে বসা হেনরির সামনেই রাজকুমারকে সারা মুখ ঠোঁট, জুড়ে চুমু খেতে লাগলাম। একটা সময় ও-ও আমাকে চুমু খেল। ওর দেবত্বকে আমি এই দুই তালুর মধ্যে আটকে ফেলেছিলাম। কিন্তু হেনরি আর কিছুতেই ওকে আঁকতে চাইল না। বলল, আমি ওকে হিংসে করি। ভালও বাসি। কিন্তু ওর ওই জ্যান্ত মুখ আমি কখনও আঁকতে পারব

না। আমি ওকে আঁকলে আগে খুন করে ওকে নিথর করে ফেলব।
খুন! সে কী? কেন?
কেননা, হেনরি বলত, প্রিন্সের মুখ নাকি ব্লাইণ্ডিংলি বিউটিফুল। যেটা চোখ এবং মন দুটোকেই পোড়ায়।
মিসেস ওয়ালশ উঠে গিয়ে এবার ওঁর রাজকুমারের ছবির সামনে টাঙানো হাল্কা নেটের পর্দাটা টেনে দিলেন। শান্তনুর এই প্রথম খেয়াল হল যে বাড়ির এই একটি ছবির সামনেই শুধু পর্দা করা। মিসেস ওয়ালশের চোখ এড়াবার জন্য ও অন্য সব ছবির দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকাতে লাগল। একেকটা ছবির নিচে একেক ধরনের সই। নামগুলোই আলাদা। শুধু মিসেস ওয়ালশের নিজের যে পোর্ট্রেটটা তিনি গর্ব করে দেখিয়েছিলেন তার নিচে একটাই শুধু অক্ষর সই করা—ডবলিউ। শান্তনু ভাবল, ওটা কি তাহলে হেনরি ওয়ালশের সই? ও ছবিটার দিকে পা বাড়াল। পিছন থেকে ভেসে এল বৃদ্ধার অতি স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর, তুমি তো বললে না রাতে ডিনারে কী খাবে?
বেশ অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াল শান্তনু। আপনার এটা তো বেড অ্যাণ্ড ব্রেকফাস্ট। এখানে ডিনার দিচ্ছেন কী করে?
মিসেস ওয়ালশ একটু দোষী-দোষী মুখ করে বললেন, দিই তো না। এখনও তো আরও আটজন বোর্ডার আছে যারা বাইরে খেতে যাবে। কিন্তু শুধু আজকের জন্য একটা ব্যতিক্রম ঘটাতে ইচ্ছে করছে। আমার রাজকুমারের দেশের লোক তুমি! অ্যাণ্ড আই উইল চার্জ ইউ ওনলি টু পাউণ্ডস ফর দ্য ডিনার। রাইট!
বলেই তুড়ি মেরে সকালের দেখা সেই টিপিক্যাল হোটেল মালকিনটি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শান্তনু সোফায় ফেলে রাখা কোটটা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে সন্ধের ব্রাইটন দেখতে বেরিয়ে গেল বাইরে।

ব্রাইটনে এসে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে শান্তনুর। সমুদ্রের ফেনামাখা শহরটা যেন পা দুলিয়ে বসে আছে জলের ওপর।

এখানে মানুষ কাজ করে? করতে পারে? করলেও নিশ্চয়ই বেড়িয়ে বেড়িয়ে করে। সমুদ্রের তট জুড়ে এত প্রমোদ, ফুর্তির আয়োজন আর সাদা সাদা ছোট-বড় হোটেলের হাট যে কূলে দাঁড়িয়ে শহরটাকে আর শহর বলেই মনে হয় না। সকালে লণ্ডন থেকে বাসে এসে এই স্ট্যাণ্ডে নামার পর শহরের ভেতরটায় আর ঢুঁ মারার ফুরসৎ হয়নি শান্তনুর। আর এখন এই সন্ধেয় যখন আলোর মালায় রঙিন হয়ে উঠেছে সমুদ্রতট ওর মনেই হচ্ছে না জল থেকে দূরে কোনও শহর আছে বলে। ক্ষণিকের জন্য একবার শুধু ইচ্ছে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বাসকরা স্মিথ পরিবারের সেই বাড়িটার তল্লাশে বেরোয়, কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হল যে সে বাড়ির এখন আর কোনও অস্তিত্ব আছে বলে জানা যায় না। লণ্ডনের বেশ কিছু শিক্ষিত বাঙালি এভাবে কবির সেই বাসভবনের খোঁজ করে গেছে। আর কিছুই হদিস করতে পারেনি। সেই স্মিথ পরিবারেরই কারও পাত্তা লাগানোও এখন রুবিকস কিউব মেলানোর চেয়ে দুষ্কর।

শান্তনু একটু একটু করে এগোতে এগোতে এসে পড়ল পিয়ের-এ। জলের ওপর ইট-কাঠ-পাথরে প্ল্যাটফর্ম করে বিনোদনের আখড়া। পিয়ের-এ দাঁড়িয়ে স্ট্যাণ্ডের ওপারে হোটেলের সারিটাকেও এখন আলোর মালা মনে হচ্ছে। শান্তনু ঠাওর করার চেষ্টা করল ওই আলোর ঠিক কোনখানে ওর নিজের বেড অ্যাণ্ড ব্রেকফাস্ট ডেরা 'মার্লিন্‌জ'। কিন্তু ওই আলোর মধ্যেই মিসেস ওয়ালশের নিভৃত কুঞ্জ হারিয়ে আছে। শান্তনু ঘুরে দাঁড়িয়ে এবার অন্ধকার সমুদ্র দেখতে লাগল। আসলে কিছুই দেখল না, কারণ এরোপ্লেনের জানালা দিয়ে উঁকি মারলে রাতের আকাশ যেমন একটা নিরেট কালো আস্তরণ এই আলো ঝলমলে পিয়ের-এ দাঁড়িয়ে ইংলিশ চ্যানেলের জলের বিস্তারও তাই। একটা কাচের জানালার কাছে গিয়ে কাচে প্রায় নাক ঠেকিয়ে দাঁড়াল ও। আর সহসা চোখে ভেসে উঠল একটা মাঝারি সাইজের ওশিয়ানিক লাইনার। দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দেয় যারা। যেরকম এক মালবাহী জাহাজে সামান্য ভাড়ায় বিলেত পাড়ি দেওয়ার আবাল্য স্বপ্ন ছিল ওর।

কিন্তু তার বদলে হাজার হাজার টাকায় টিকিট কিনে কয়েক ঘণ্টার প্লেন জার্নি করে লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে এসে আছাড় খেয়ে পড়তে হয়েছে ওকে। বিলেতের সমস্ত সাবেক রোম্যান্সগুলো একে একে উবে যাচ্ছে জীবন ও কল্পনা থেকে। আর ঠিক তখনই শান্তনুর মনে পড়ল মিসেস ওয়ালশের ছবিটার কথা। রবীন্দ্রনাথের যে অজ্ঞাত পোর্ট্রেটটাকে মহিলা নিজের রাজকুমার বানিয়ে এক কোণে গচ্ছিত করে রেখেছেন। বাঙালী হিসেবে শান্তনুর মনে হল ছবিটার জায়গা এক বৃদ্ধ হোটেলউলির ড্রইংরুমে নয়। লণ্ডনের কোনও ভদ্র গ্যালারিতে। মুখের সিগারেটটা জলে ছুঁড়ে দিয়ে ও আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল পার্শ্বস্থ পাব-এ। আর একটা বিয়ার অর্ডার করে জলের দিকে মুখ করে বসল।

কিন্তু জলের দিকে মুখ থাকলেও মন ছড়িয়ে যাচ্ছে ডাইনে-বাঁয়ে। ডাইনের কাফেতে একটি স্বল্পবসনা সুন্দরী হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে গাইছে ডরিস ডে-র সেই বিখ্যাত গান 'কে সেরা সেরা', অদূরে ছেলেছোকরার দল স্লট মেশিনে পয়সা ফেলে ফেলে জুয়ো খেলছে আর কিছু কচিকাঁচা নানা রকমের ম্যাজিক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের বিকৃত প্রতিবিম্ব দেখে দেখে হো হো, হা হা করে দমফাটা হাসি হাসছে। আর বাঁয়েও আরেক ধরনের জাদুগিরি চলছে, শুধু মোটা, কালো পর্দার আড়ালে। যেখানে তাঁবুর ভেতরে ক্রিস্টাল গ্লোবের সামনে বসে আধা অন্ধকারে খদ্দেরের ভবিষ্যৎ শুনিয়ে যাচ্ছেন এক মধ্যবয়সী রূপসী জিপসি। মহিলার ছবি তাঁবুর সামনে ঝুলছে, পাশে প্ল্যাকার্ডে লেখা দু' পাউন্ডের বিনিময়ে আপনারা ভবিষ্যতের সব রহস্য জেনে নিন। এই ডাইনে আর বাঁয়ের টানের মধ্যে বিশেষ হেরফের নেই শান্তনুর কাছে। ডাইনের 'কে সেরা সেরা' গানের অর্থ যা হবার হবে, ভেবে লাভ নেই। বাঁয়ের জিপসির বলা ভবিষ্যতেও কোনও কৌতূহল নেই ওর। কৌতূহল যদি আদৌ কিছু থেকে থাকে তবে ওই রূপসী মহিলাটির সামনে একটি বার বসা আর ওঁর আজগুবি ধানাই পানাই শোনা। জাস্ট ফর কিকস্।

শেষে পাউন্ডের দুটো নোট বার করে শান্তনু হাঁটা দিল বাঁ দিকের

তাঁবুর দিকে। আর ভেতরে ঢুকেই আফসোস করতে লাগল। গল্প-কাহিনীতে যা-যা বর্ণনা থাকে জিপসি ক্লেয়ারভয়্যান্ট বা ভবিষ্যদ্বক্তাদের তার থেকে কোনও ভাবেই আলাদা নন এই মাদাম আলমেরা। ঢুকতেই মহিলা বলে উঠলেন, জু! ইহুদি? বিরক্ত হয়ে শান্তনু বলল, নো। 'হিন্ডু। মহিলা তখন বললেন, ডক্তর? শান্তনু বলল, স্টুডেন্ট অফ ল'। আইন। দু দুবার ধাক্কা খেয়েও কোনও রকম বিব্রত হলেন না মাদাম আলমেরা। কালো সিল্কের জোব্বার থেকে চুড়ি-বালায় ভর্তি ফর্সা দুটো হাত বার করে জাদু গোলকটা ঘুরিয়ে নতুন করে সাজিয়ে নিলেন তিনি। তারপর একটা ছোট্ট কার্ড এগিয়ে দিলেন শান্তনুর দিকে। বললেন, ঠিক ঠিক করে প্রশ্নের জবাব লিখে দাও। ডোন্ট মেক, এনি মিস্টেক।

শান্তনু দেখল তাতে নামধাম গোত্র সব কিছু চাওয়া হয়েছে। আর শেষে একটা প্রশ্ন ঃ তোমার প্রিয় রঙ কী। শান্তনু টকটক্ করে যা লেখার লিখে দিয়ে দু দণ্ড থমকে রইল রঙের প্রশ্নে। একবার ভাবল সমুদ্রের নীল রঙটা উল্লেখ করে। পরে ভাবল সমুদ্রের গাঙচিলের সাদা রঙটা। তারপর কুয়াশার ধূসর রঙ। তারপর মাদাম আলমেরার চড়া লিপস্টিকের লাল। কিন্তু শেষে লিখে ফেলল খয়েরি। হয়তো ক্ষণিকের জন্য মনে পড়েছিল মিসেস ওয়ালশের রাজকুমারের ছবির জামার রঙটাই। কার্ডটা হাতে নিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে জিপসি বললেন, ওয়েল! ওয়েল! ইউ আর আ লাকি গায়। খুব সৌভাগ্য তোমার। মেরুন অন আ স্যাটার্ডে। দ্যাটস লাকি। বলেই চোখ কুচকে ভূতগ্রস্তের মতো জাদু গোলকের ভেতর দৃষ্টি চালাতে লাগলেন মহিলা। আর অদ্ভুত এক ভৌতিক খনখনে গলায় কত যে কী বলে যেতে লাগলেন যা শুনতে শুনতে বেশ কবারই শান্তনুর মনে হল উঠে পিট্টান দেয়। টাকা যা গচ্চা গেছে গেছে। তা বলে বেকার এই সব হুমতাম শোনার কোনওই মানে হয় না। মহিলা যা বলছেন তা সবই শান্তনুর ভবিষ্যৎ, যার কোনও কিছুতেই ওর বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। ও শুধু লক্ষ্য করতে লাগল মহিলার অঙ্গভঙ্গি,

চোখ নড়া, ভুরু খেলা, ঠোঁট কাঁপানো, তুড়ি মারা আর চাপা গোঙানির আওয়াজ থেকে থেকে। হঠাৎ মেলা বাজে কথার মধ্যে একটা কথা বলে প্রায় হাসিয়ে দিলেন ওকে। যখন বললেন, ভীষণ মূল্যবান কিছু খুঁজে পাওয়ার যোগ এসে গেছে তোমার। এমন কিছু জিনিষ যা তোমার জীবনকেই বদলে দেবে। মূল্যবান করবে।

শান্তনু বুঝল এটা একটা বাঁধা গৎ মহিলার। বিদেশী ছাত্রদের কাছে মূল্যবান প্রাপ্তি হল বিলেতের ডিগ্রি। যা জীবনের মূল্য বাড়িয়ে দেয় অচিরে। শান্তনু আওয়াজ করে হাসতেই যাচ্ছিল, কিন্তু ভদ্রতা বোধ থেকে সামলে নিল নিজেকে। আর ঠিক তখনই কী করে কী করে যেন, মনে পড়ে গেল মিসেস ওয়ালশের ছবিটার কথা। ওটাই কি গুপ্তধনের মতো কপালে ঝুলছে শান্তনুর? কিন্তু ভাবনাটা আসামাত্রই লজ্জিত বোধ করল শান্তনু। ব্যক্তিগত সংগ্রহ নয়, যদি কোথাও ওটার স্থান হওয়া দরকার তো লণ্ডনের কোনও সম্মানিত গ্যালারি বা মিউজিয়ামে। মিসেস ওয়ালশের ডেরাতেও বেচারি রবীন্দ্রনাথ বড়ই বিপন্ন।

ইচ্ছে করেই মিসেস ওয়ালশ ডিনারের টেবিলে মোমবাতি জেবলে বিদ্যুতের আলো নিভিয়ে রেখেছিলেন। জন্মদিন-টিনে যেমন সাজেন বয়স্ক মেমরা ঠিক তেমন সাজ ভদ্রমহিলার। টেবিলে যা খাদ্যের সরঞ্জাম তা দু পাউণ্ডের বিনিময়ে পাওয়া যেত হয়তো বিশ বছর আগে। এখনকার মাগ্গিগণ্ডার ইংল্যাণ্ডে যে কোনও খাবারের একটা ডিশেরই দাম পড়বে দু' পাউণ্ড। বস্তুত আজকের ডিনারে শান্তনু অতি সাধারণ যে ফরাসি ওয়াইনটা বগলে করে এনেছে তার দামই পড়ে গেছে সাড়ে তিন পাউণ্ড। ও বৃদ্ধাকে একটু হকচকিয়ে দিয়ে বোতলটা ঠক্ করে টেবিলের মাঝখানে রাখল। মিসেস ওয়ালশ বললেন, মাই প্রিন্স উভ নেভার কাম টু ডিনার উইদাউট আ বট্ল্ অফ ওয়াইন।

শান্তনু বিস্মিত হবার ভান করে বলল, রিয়েলি? মহিলা সঙ্গে সঙ্গে যোগ করলেন, আর মোমবাতির আলোয় ছাড়া কখনও ডিনারে

বসেনি সে।
তারপর খাবার বাড়া শুরু করলেন বৃদ্ধা। সংলাপ বজায় রাখার জন্য শান্তনু বলল, কিন্তু আপনাকে ছেড়ে গেলই বা কেন? আর এসেছিল বা কোত্থেকে?
গেলাসে ওয়াইন ঢালতে ঢালতে মহিলা বললেন, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। আগে খুব বলতাম লোক পেলে। এখন বয়স হয়ে সব ঠিকঠাক মনেও করতে পাচ্ছি না। শেষ বার রাজকুমারের গল্প বলেছিলাম বছর পনের আগে। একটা রুশ-ইহুদি অধ্যাপককে। ইণ্ডিয়া-টিণ্ডিয়া নিয়ে কী সব গবেষণা করত। সেই রাতেই হেনরির স্ট্রোক হয়। সিন্স দেন আই হ্যাভ নেভার আস্কড্ এনিওয়ান টু ডিনার। ওই একটু-আধটু ছবিটা দেখাই, এই যা।
ওয়াইনে চুমুক দিয়ে শান্তনু আস্তে করে বলল, অ!
বাট ইউ আর লাকি মাই বয়!—হঠাৎ সোল্লাসে বলে উঠলেন মিসেস ওয়ালশ। আজ আমার সত্যিই রাজকুমারের গল্প শোনাতে ইচ্ছে করছে। হেনরি বলত রাজকুমার নাকি আইন পড়তে এসেছিল ইংল্যাণ্ডে। হি ওয়জ থার্ড ইন লাইন টু দ্য থ্রোন। কিন্তু ওই সিংহাসন-টিংহাসনের বিশেষ ধার ধারত না। ওর আইন পড়াও ছিল জাস্ট আই ওয়াশ। অল হি লাভড্ ওয়জ উইমেন। নারী! আর সেই লোকটাকেই আমি বাহুডোরে বেঁধেছিলাম। এই তোমার মতো উইক-এণ্ডে বেড়াতে এসেছিল ব্রাইটনে। তারপর আর লণ্ডনে ফিরে যেতে পারেনি।
হঠাৎ কেন জানি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে শান্তনু বলল, ফিরে যায়নি!
মাথা নাড়তে-নাড়তে বৃদ্ধা বললেন, নো! যে-সন্ধ্যায় ও আমাকে হেনরির সামনে বিয়ের প্রস্তাব দেয় আর আমি গ্রহণ করি ও নার্ভাস হয়ে ফের একতলা-তিনতলা দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দেয়। হেনরির কোনও ভাবান্তর নেই, হি লুকড্ লাইক আ লস্ট ম্যান। শুধু যে আমাকে জয় করল সে পাগল হল। দিনটা ছিল গরমের। অনেক দৌড়োদৌড়ি করে রাজকুমার শেষে স্নানের পোশাকে বেরিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে। আমি ব্যালকনি থেকে দেখলাম ও সূর্যাস্তের মুহূর্তে ঝাঁপ দিল জলে।

মিসেস ওয়ালশ চুপ করলেন। সম্ভবত একটু দম নেবার জন্য। কিন্তু শান্তনু আর কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারছে না। মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, তারপর ?

ভোরের দিকে ওর দেহ ফিরে এল ঢেউয়ের সঙ্গে। সমুদ্রের মাছে ওর মুখ ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে, চোখের গর্ত দুটোয় দুটো পাথর জমে আছে। সারারাত পাড়ে বসেছিলাম আমি। ওকে চিনলাম ওর কাদামাখা শরীর দেখে নয়, সাঁতারের পোশাকে। যেখানে ওর নামের আদ্যক্ষর এমব্রয়ডারি করে দিয়েছিলাম আমি।

কী সেই আদ্যক্ষর ?

মিসেস ওয়ালশ মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বললেন, ও দ্যাটস নট ইমপর্ট্যান্ট। আমার কাছে ও শুধুই রাজকুমার। বস্তুত ওর নাম আমার আর মনেও নেই।

এবার আসল কথাটা পাড়ার মোক্ষম সময় হয়েছে শান্তনুর। ও খাওয়া শেষ করে ওয়াইনে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, কিন্তু আপনার সেই রাজকুমারের ছবি ওটা নয়, যা আপনি দেখিয়ে থাকেন লোককে।

মুহূর্তের মধ্যে যেন কবরের নীরবতা নেমে এল ঘরে। সাপের ছোবল খাওয়া লোকের মতো সারা মুখে যন্ত্রণা নিয়ে চিত্রার্পিত হয়ে গেছেন মিসেস ওয়ালশ। গোটা ডিনার টেবিলটা হাতে করে উল্টে দিলেও তিনি এর বেশি অবাক হতে পারতেন না। শান্তনু শুধু অপেক্ষায় ছিল সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কখন মহিলা চিৎকার করে উঠবেন, গেট আউট ! ইউ বাস্টার্ড !

উল্টে সম্বিৎ ফিরতে খুব সংযত স্বরে মিসেস ওয়ালশ বললেন, তুমি কেন বললে ওটা ও নয় ?

কারণ ওটা আমাদের বাংলা ভাষার সেরা কবি, প্রিয় কবি, এক অত্যন্ত মহৎ কবির পোর্ট্রেট।

কী নাম তাঁর ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর !

না, এ নাম কখনও প্রিন্সের হতে পারে না। প্রিন্স প্রেমিক ছিল, কবি নয়।

কিন্তু ওই ছবি টেগোরের, কোন প্রিন্সের নয় !
কিন্তু তোমার ওই কবিকে এখানে কে আঁকতে যাবে ? সে কি কখনও এসেছে এখানে ?
অবশ্যই ! তবে আপনার জীবনকালে নয়। বস্তুত উনি এখানে থেকেছেন গত শতাব্দীর শেষ দিকে। তখন হয়তো কেউ···
শান্তনু কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই মৃদু চিৎকার করে উঠেছেন মিসেস ওয়ালশ—নো ! এ ছবি আমি আঁকিয়েছি হেনরির বন্ধু কার্ল ফিটজিমনকে দিয়ে। কারণ ওর মৃত্যুর পরেও হেনরি রাজকুমারকে আঁকতে চাইল না। অথচ একমাত্র ওই দেখেছিল আমার প্রিন্সকে।
মিসেস ওয়ালশ ন্যাপকিন নিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে বললেন, তাহলে এসো আমার রাজকুমারকে দেখবে। বলেই টেবিলের ওপার থেকে এসে শান্তনুর হাত ধরে ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন ডাইনিং রুমের অন্য প্রান্তে। গিয়ে একটা দরজা খুললেন, তারপর একটু গিয়ে আরেকটা দরজা। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন সেলারে।
এই দেখো রাজকুমার !—বলে একটা মস্ত চেস্টের ডালা খুলে ধরলেন মিসেস ওয়ালশ। ওঁর হাতের মোমবাতির আলোয় আবছা ভাবে শান্তনু দেখল একটা পাঁচ ফুট দশ-এগারো ইঞ্চির কঙ্কাল দাঁত বার করে শুয়ে। ধরা গলায় শান্তনু কোনওক্রমে বলল, এ আপনার রাজকুমার ?
ডালাটা নামিয়ে রাখতে রাখতে মিসেস ওয়ালশ বললেন, হ্যাঁ। আমি ওর দেহ পোড়াইনি, কবরও দিইনি। ওকে পোশাক পরিয়ে সোফায় বসিয়ে ফিটজিমনকে বলেছিলাম, আঁকো। ধীর পায়ে সেলার থেকে বেরুতে বেরুতে শান্তনু বলল, কিন্তু রাজকুমারের মুখ তো মাছে নষ্ট করে দিয়েছিল। শিল্পী কী ভেবে আঁকলেন ?
ড্রইংরুমের সোফায় এসে বসতে বসতে মিসেস ওয়ালশ বললেন, মুখের বর্ণনা আমি দিয়েছিলাম। ও শুনে শুনে ধারণা করে আঁকল।
তাই ? শুনি সেই বর্ণনা।

ওহ্! আমি শুধু বলতাম, একটা অল্প বয়সি ঈশ্বর আঁকো। তার ঘাড় অব্দি গড়িয়ে পড়ে কোঁকড়া কালো চুল। তার নাক টিকোল। তার চোখ সব দেখে, আবার কিছুই দেখে না। ছবির ক্রাইস্টের মতো। ওর দাড়ি, গোঁফ…না, না। এত কথা বলতাম না আমি। শুধু বলতাম, আমাকে অল্পবয়সি ভগবান এঁকে দাও। একদিন শিল্পী বলল, ওর হাতে কি একটা ধর্মগ্রন্থ দিয়ে দোব। আমি প্রতিবাদ করলাম, সে কী! ঈশ্বর কি ধর্মগ্রন্থ পড়েন? বরং কোনও কবিতার বইটই দাও, প্রেমের কবিতা। যদিও প্রিন্সের কাব্য ছিল নারী। ওহ্ হাও হি লাভড্ উইমেন!
মিসেস ওয়ালশ চোখের ওপর হাত রাখলেন আলো আটকাতে। চোখ অন্ধকার করে ভেতরের রাজকুমারকে দেখবেন বলে। শান্তনু ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস কবল, শেষ অবধি এই মুখটা কি আপনার প্রিন্সের মতো হয়েছিল?
মিসেস ওয়ালশ উত্তর দিলেন না। তিনি হারিয়ে গেছেন তাঁর প্রিন্সের পৃথিবীতে।

ব্রেকফাস্ট শেষ। শান্তনু এবার থাকা-খাওয়ার বিল চুকিয়ে বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাবে। কী মনে করে ও ওব লণ্ডনের স্টুডেণ্টস হোস্টেলের ঠিকানার ওপর নাম লিখে পাশে দাঁড়ানো মিসেস ওয়ালশের হাতে দিল। বলল, টেগোরের এই ছবি যদি লন্ডনের কোনও গ্যালারিতে দিতে রাজি হন আমাকে একটা খবর দেবেন। খুব ভাল দাম পাবেন নিশ্চয়ই। বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার বন্ধু ফিটজিমন আপনার রাজকুমারকে আঁকেনি। ও টেগোরের একটা ছবি দেখে এই পেন্টিং করেছে। কিন্তু করেছে খুব ভাল। ইট ইজ আউট অ্যাণ্ড আউট টেগোর। ইন নো ওয়ে ইয়োর প্রিন্স। যদি না অবিশ্যি আপনার প্রিন্স…
কথা শেষ হয়নি শান্তনুর, ডুকরে কেঁদে উঠেছেন মিসেস ওয়ালশ। প্রথমে তুমি প্রমাণ করতে চাইলে যে এ ছবি রাজকুমারের নয়। এখন সেই ছবিটাও কেড়ে নিতে চাইছ।
মিসেস ওয়ালশ বসে পড়লেন পাশের একটা চেয়ারে। . শান্তনুর

মনে হল মহিলা ফের সেই স্বপ্নের দেশে যাত্রা করতে চলেছেন। বেশ আফসোস হচ্ছে ওর স্বপ্নগুলোকে দুমড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাঙালি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ছবিটার যোগ্য স্থানান্তরের বাসনাটাও মরে না। ও উঠে পড়ে বৃদ্ধার পিঠে সস্নেহ হাত রেখে নরম করে বলল, মিসেস ওয়ালশ, তোমার তো বয়স হয়েছে। আর কটাই বা দিন। তুমি না থাকলে ওই প্রিন্সের ছবির কে কদর করবে বল? তার চেয়ে সারা বিশ্বের লোক এসে দেখুক তোমার রাজকুমারকে। যার মুখ ঈশ্বরের মতো। দেখে বিস্মিত হয়ে প্রণাম করুক। প্রত্যেকে নিজের মতো দেখুক সেই ঈশ্বরের মুখ যা ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। যে ঈশ্বর নারী ভালবাসেন, কাবণ নারীই তাঁর কবিতা। তাই না?

চোখ বুজে সব শুনছিলেন বৃদ্ধা। এই প্রথম ওঁর রাজকুমারকে ওঁর নিজের অনুভূতির ভাষা দিয়ে কেউ বর্ণনা করছে। ভীষণ ভাল লাগছে শুনতে। চোখ আর খুলতেই চায় না। এই ভারতীয়গুলোর মধ্যে সত্যিই কোনও জাদু আছে। যখন ওরা তোমার সব কিছু কেড়ে নিয়ে তোমায় সর্বস্বান্ত করে তখনও তোমায নিপুণভাবে বুঝিয়ে দেয় যে আখেরে জিৎ হল তোমারই।

হৃদয়ের কথা

'শমি! শমি!' করে প্রচণ্ড জোরে হেঁকে উঠেছে মা একতলা থেকে। শর্মিলা হ্যাঁ করে মিলিদির নাচের স্টেপিং প্র্যাক্‌টিস দেখছিল। লাল বেলবটম ট্রাউজার্স আর কালো টপ-এ কী রকম মেমসাহেব-মেমসাহেব হয়ে মিলিদি আয়নার সামনে বিলিতি নাচ অভ্যেস করে চলেছে। শর্মিলা এসব নাচের কিছুই বোঝে না, কিন্তু একনাগাড়ে মিলিদিকে ওভাবে নাচতে দেখলে একটা ঘোর লাগে ওর। কখনো কখনো ধন্ধ লাগে, মিলিদি এসব নাচ কোথায় নাচে? কাদের সঙ্গে নাচে? পুরুষদের কোমর জড়িয়ে? ইস্‌! মিলিদিটা কী!

হঠাৎ মা'র ডাকে চট্‌কা ভাঙল যেন শর্মিলার। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভয়টা দুরদুর করে গলায় উঠতে থাকল। চেঁচিয়ে যে বলবে 'মা আসছি!' তারও উপায় রইল না, গলাটা বুঝি বসেই গেল। মিলিদির ঘর থেকে বারান্দায় পড়ে সজোরে চটি ফটফটিয়ে সিঁড়ি অব্দি এসে আওয়াজ তুলে নামতে থাকল শর্মিলা। মা বুঝুক শমি ফেরৎ আসছে।

কিন্তু মা যা বোঝার তা বুঝেই গেছে। রাগে গজরাচ্ছে মা। ফের ওই অসভ্য মিলিটার পাল্লায় পড়েছে শমি। তের-চোদ্দ এই বয়সটাই সবচেয়ে মারাত্মক সময় মেয়েদের জীবনে। কতরকম মাথা চিবুনো, বুদ্ধি চটকানো প্রলোভন চারদিকে, অসভ্য কৌতূহল কত, ছেলে-ছোকরাদের কত উপদ্রব আর হাতছানি। তার ওপর শমিটা এক বিশ্বন্যাকা! নিজের কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ এখনও পাখি-পড়ানো করে ইস্কুল পাঠাতে হয়। রাস্তায় গোলমাল হলে ইস্কুলের বারান্দায় বসে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদে। তার ওপর বাপের কুলের ধারায় লম্বা চওড়া ফর্সা। বাস্তবিকই সুন্দরী। এ মেয়ে

নিজেকে না সামলালে কে ওকে দিনে-রাতে পাহারা দিয়ে বেড়াবে ! মা'র ভয়গুলো শর্মিলা জানে। কিন্তু নিজের ভয়গুলো পুরোপুরি বুঝতে পারে না। ওর একটা বড় ভয় অবিশ্যি মা'কে। রাগ চড়লে মা চণ্ডাল হয়ে যায়। তখন হেন কাজ নেই যা মা করতে পারেনা। ছেলেকে ঘাড় ধরে বসিয়ে কদম ছাঁট দেওয়া থেকে কিলিয়ে চড়িয়ে মেয়ের গায়ে কালশিরে ফেলে দেওয়া পর্যন্ত। কথাটা মনে হতেই বুকের দুরুদুরু স্পন্দনটা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল শর্মিলার। অজান্তেই বাঁ হাতটা উঠে গিয়ে ঠেকল বুকের মাঝখানে। মুখটা ভয়ে একটু যেন ফাঁক হল। মা'র আজকের ডাকটা সেই রাগী, হাড়কাঁপানো ভাব। বৃষ্টির আগের বজ্রবিদ্যুৎ। ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া অবস্থাতেও শর্মিলা স্পষ্ট শুনল মা'র ফের একপ্রস্থ হাঁক 'শমি ! অ্যাই শমি !' সিঁড়ির শেষ তিনটে ধাপ আর ভদ্রভাবে নামা হল না শর্মিলার, ও এক লাফে ছিটকে এসে পড়ল চাতালে। যেন পিছন থেকে ধাক্কা মারল কেউ। পড়ে 'উঃফ্ ! বলে ককিয়ে উঠে হাঁটু ধরে বসে রইল। কিন্তু তাতেও সামাল দেওয়া গেল না মা'কে।

মা ফ্ল্যাটের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসে চুল ধরে হ্যাঁচকা টানে টেনে তুলল মেয়েকে ! তারপর হিড়হিড় করে টেনে ওকে ফ্ল্যাটের ভেতরে খোলা উঠোনটায় নিয়ে ফেলল। তারপর পাশের জানালার শিকে গুঁজে রাখা নরম মলাটের একটা বই টেনে বার করে ছুঁড়ে মারল মেয়ের মুখে। 'কোত্থেকে পেয়েছিস তুই এ বই আমাকে বল !' —মার এই এতখানি বলারও বোধহয় দরকার ছিল না, বইটা দেখামাত্র শর্মিলার হৃদপিণ্ড গলায় এসে ঠেকেছে। সর্বনাশ ! ওই বই মা খুঁজে পেয়েছে ! শর্মিলা আর কিছু বলারও চেষ্টা করল না। চোখ বুঁজে, দু' হাতে চোখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল। এখন শুধু রণমূর্তি মা'র কিল চড় থাপ্পড়ের অপেক্ষা। এতটা অসহায় শর্মিলার কোনদিন লাগেনি নিজেকে। প্রথম আঘাতটার আগেই এভাবে আত্মসমর্পণ কোনদিন করতে হয়নি ওকে। মিলিদি ওর জীবনটা শেষই করে দিল অ্যাদ্দিনে।

বইটা নারী-পুরুষের নগ্ন ছবির অ্যালবাম একটা ! শর্মিলা ভাল

করে উল্টেও দেখেনি। রঙিন বিলিতি বইটা পড়েছিল মিলিদির ড্রেসিং টেবিলের একপাশে। মিলিদি আয়নার সামনে টুলে বসে সাজছিল। ধারে খাটের কোণটায় পা ঝুলিয়ে বসে শর্মিলা মিলিদির সাজগোজ দেখছিল। হঠাৎ বইটা নজরে পড়তে জিজ্ঞেস করে বসেছিল, ওটা কী বই মিলিদি ?

মিলিদি যেন এই প্রশ্নটারই অপেক্ষায় ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে খোঁপার ফিতে কামড়ে ধরা অবস্থাতেই বলল, ন্যাকা। হাতে নিয়ে দেখতে পারিস না ?

শর্মিলা আয়নার দিকে সরে এসে বইটা হাতে নিতে গিয়ে যেন সাপের ছোবল খেল। প্রচ্ছদে একটা সম্পূর্ণ বিবসনা নারী। মেমসাহেব। শর্মিলা বইটা না তুলে বলল, থাক্।

কিন্তু ছাড়ল না মিলিদি। খোঁপার গিঁটটা শেষ করে বইটা নিয়ে শর্মিলার পাশে বসে গেল। ফর্ফর করে বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে ওড়াতে লাগল একটার পর একটা পাতা। আর মুখে বলতে থাকল, দ্যাখ! এই হচ্ছে মেয়েদের শরীর! দ্যাখ, পুরুষদের এই দেখতে! দ্যাখ। নিজেকে দেখেছিস কখনো আয়নার সামনে ওভাবে ? ন্যাকা যত!

সত্যি, শর্মিলা বাচ্চা ছেলে ছাড়া পুরুষদের কেমনটি দেখতে হয় জানেনা। বাড়িতে পুরুষ বলতে বাবা আর ছোট ভাই দেবু। তাদেরকে ওভাবে ? ছি! ভাবতেই গা-টা গুলিয়ে উঠল যেন। এক লহমায় দেখা পুরুষদের ওই চেহারাগুলোও কীরকম বিচ্ছিরি লাগল ওর। পোশাক পরা অবস্থাতেই তো পুরুষরা কত সুন্দর, স্মার্ট, আকর্ষণীয়। মিলিদি এসব কী দেখাল ওকে অযথা ?

মিলিদি বলল, নিজেকে দেখিস আয়নাতে ?

শর্মিলা ঘাড় নেড়ে বোঝাল, না।

মিলিদি বলল, মরণ। কবে অ্যাডাল্ট হবি তোরা ?

শর্মিলা আস্তে করে বলল, ওসব কথা ছাড়। আমার অ্যাডাল্ট হয়ে কাজ নেই।

মিলিদি বলল, ছাড়বে! যা নিয়ে যা বইটা। উল্টে পাল্টে দ্যাখ। নিজের শরীরটাকে চেন। বড় হচ্ছিস, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো

চিনতে শিখবি না? নিজের জিনিসগুলোর যত্ন শিখবি না? ঠকবি না হলে শেষে। এই বলে দিলাম।
বলে ঠোঁটে লিপস্টিকের শেষ ছোঁয়াচটুকু মিটিয়ে মিলিদি হন হন করে ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল। একা ওর বিছানার ওপর পড়ে রইল শর্মিলা। পাশে অ্যালবামটা।
তারপর কখন এক সময় অজ্ঞাত কোন্ কৌতূহলে নরম মলাট বইটা হাতে তুলে নিয়ে নিচে নেমে এসেছে শর্মিলা। তারপর থেকে বইটা হয় এখানে লুকোচ্ছে নয়তো ওখানে। মা দেখতে পেলে রক্ষে রাখবে না। আর ওই লুকোনই সার। খুলে আর একটি পাতাও দেখা হয়নি। আর সত্যি বলতে কি, দেখার ইচ্ছে হয়নি।
অথচ সেই বই পড়ে গেল মার হাতে। আর এখন মার হাতের কিল চড় থাপ্পড়......না, কোথায় সেসব? চোখ বুঁজে মুখ ঢেকে কতক্ষণ বসে আছে শর্মিলা। কিন্তু মা তো মারছে না। শর্মিলা চোখ খুলে দেখল মা পাথরের মূর্তির মতো ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। আর অঝোরে জল গড়াচ্ছে দু চোখ বেয়ে।
শর্মিলা ছুটে গিয়ে মার বুকে মুখ লুকিয়ে চাপা গলায় কাঁদতে লাগল, মা, আমি দেখিনি ও বই মা। মিলিদি দিয়েছিল, আমি কিন্তু দেখিনি মা।
কখন এক সময় মার হাত উঠে এসেছে শর্মিলার মাথার ওপর। মার আঙুল বিলি কাটছে শর্মিলার চুলে। মার চোখের জল শুকিয়েছে, কিন্তু কান্নার ভাব পড়েছে গলায়। ভাঙা কণ্ঠে মা বলল, শর্মি আমাদের খুব সাধারণ জীবন। তোর বাবা আর আমি দুজনে চাকরি করি তোদের জন্য। আমাদের নিজস্ব বলে কিছু নেই রে শর্মি তোরা ছাড়া। আমাদের হারিয়ে দিসনি মা।
রাগে দুঃখে লজ্জায় শর্মিলার এবার গলা ছেড়ে কাঁদার ইচ্ছে হচ্ছে। এভাবে কথা না বলে মা ওকে দু ঘা দিলে ঢের ভাল ছিল। মার মুখে এসব কথা অসহ্য লাগছে শর্মিলার। ও হাত দিয়ে মার ঠোঁট চাপা দিয়ে বলল, এসব বলোনা মা, প্লিজ। তুমি যদি ভাবো আমি তোমাদের দুঃখ বুঝিনা, তাহলে মেদিনীপুরে দাদু-দিদার কাছে পাঠিয়ে দাও আমাকে। আমি কিছু মনে করব না।

কথাটা বলেই শর্মিলা বুঝল ওর গলা ভেঙে গেছে! গলার কাছে কান্নার দলাটা পাথর হয়ে এল। এবার বুকে নেমে বুক ফাটিয়ে দেবে। দাদুর ওখানে পাঠাবার কথা উঠলেই চেচাঁমেচি শুরু করে দিত শর্মিলা। বলত, ভারী আমার শিক্ষাদীক্ষা! কেন, কলকাতায় পড়াশুনো হয় না? আমি কি মুখ্যু যে মেদিনীপুরে বাজে ইস্কুলে পড়তে হবে? ওই অজ পাড়াগাঁয়ে কোনও ভদ্রলোকে যায়?
ভীরু নাবালিকার সমস্ত জেদ আর অভিমান ফুটে বেরুতো ওই এক মেদিনীপুরের নামে। দু চক্ষের বিষ যেন জায়গাটা ওর কাছে। দাদু-দিদার আদর যত্ন আস্কারা সব আছে। আবার কিছুই যেন নেই! না স্মার্ট ছেলেমেয়ে, উত্তম-সুচিত্রা-সৌমিত্রর নতুন বাংলা ছবি, রাস্তায় ট্রাম বাস লরি, নতুন নতুন দোকান, ফুচকা, বুড়ির চুল, শোনপাপড়ি, আলুর দম, বাড়ির পাশে গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ লেক, ছাদে দাঁড়ালে কলকাতার সকাল বিকেল সন্ধ্যা। আর কদিন যাবৎ মনে হচ্ছে মেদিনীপুরে তো আনন্দদা'র মতো ভদ্র, সুদর্শন, ইংরিজি জানা প্রাইভেট টিউটরও নেই।
লেক, গড়িয়াহাট, বাংলা ছবি শর্মিলা বড় একটা পায় না। শুধু ওগুলো আছে এই ভেবেই আনন্দ। কিন্তু আনন্দদা'কে সপ্তাহে দু'দিন করে পায়। আর যতক্ষণ সে থাকে, পড়াক চাই গল্প করুক চাই চুপটি মেরে, শর্মিলার বুকটা কীরকম উষ্ণ, ভরাট হয়ে থাকে। কলম কি খাতা দেওয়া নেওয়া করতে গিয়ে হাতে হাতে ছোঁয়া লাগলে কীরকম শিহরণ হয় শর্মিলার মধ্যে। মিলিদিকে একবারটি একথা বলতে মিলিদি ফস্ করে বলে বসল, তুই ওর প্রেমে পড়েছিস! মিলিদিও যেমন! কোনও ভাল লাগার মানে জানেনা, শুধু প্রেম, লাভ্ এই সব আজেবাজে কথা। সেই থেকে আনন্দদা'র কথা আর কাউকে বলেনি শর্মিলা। সব আবেগ, অনুভূতি কেবল নিজের মধ্যে নিয়ে বসে আছে। আনন্দদা'টাও এসব কিছু বোঝে কিনা ভগবান জানে। সারাক্ষণ একটা গম্ভীর গম্ভীর ভাব। চশমার পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে কখন কী দেখে তা বোঝে কার সাধ্য! পড়ার বাইরে দুটো অকারণ কথা বললেই যেন চরিত্র খোয়া যাবে।

শর্মিলা ফের বলল, মা, আমি মেদিনীপুরেই পড়ব। তুমি দাদুকে লিখে দাও।
রাগারাগি, কান্নাকাটির পর মা এখন হতভম্ব হয়ে আছে। মেয়ে নিজে থেকেই বলছে মেদিনীপুর যাবে। এর আগে কত সাধ্যসাধনা, কিন্তু কে টলায় তাকে? আর এখন···
মা'র আরেকটা দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আনন্দ। ইংরেজিতে গবেষণা করছে ছেলেটা, বাবা নেই, মাকে নিয়ে দিদির সংসারে থাকে। চাকরি একটা দরকার ঠিকই, কিন্তু গবেষণা না মিটিয়ে অধ্যাপনা শুরু করতে চাইছে না। রিসার্চ গ্রাণ্ট সব বই আর গানের রেকর্ড কিনতেই খুইয়ে বসে। টিউশনির এই টাকাটা দিয়ে হাত খরচ মেটায়। কী করে যে হঠাৎ যোগাযোগ হল ওর সঙ্গে তা ভাবলে মারও অবাক লাগে।
শর্মিলা, দেবু আর ওদের বাবার সঙ্গে জগন্নাথ এক্সপ্রেসে পুরী যাওয়া হচ্ছিল। আনন্দ ছিল চার বন্ধুর সঙ্গে। যাদেব একজন মিষ্টি গলায় উর্দু গজল গাইছিল। নাম লালা। লখনৌয়ের অবাঙালি ছেলে, নিউ মার্কেটে পর্দার কাপড়ের দোকান। গান শেষ করে শর্মিলাকে বলে বসল, আপনি গান জানেন না ম্যাডাম?
ম্যাডাম ডাক শুনে কানটান লাল হয়ে এসেছিল শর্মিলার। একেবারে চুপ মেরে গেছে। মা বলছে, বাবা বলছে, ভাই বলছে। কিন্তু শমির মুখে টুঁ শব্দটি নেই। তখনই যেন এক পাশ থেকে বিশুদ্ধ বিলিতি-বিলিতি অ্যাক্সেণ্টে আনন্দ বলে উঠল, বি আ স্পোর্ট! ডু গিভ্ আস আ নাম্বার। এসব কথার কী যে মানে, কী যে রহস্য কিছুই বোঝেনি ক্লাস টেনের মেয়েটা। কিন্তু প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো গেয়ে উঠেছিল 'দক্ষিণীতে' শেখা রবীন্দ্র সঙ্গীতটা 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ।'
মা নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছিল তার ন্যাকাবোকা মেয়ের কণ্ঠে অত পরিমার্জিত, বুঝে-গাওয়া গানটা শুনে। মেয়েটার ভেতরে তাহলে সাবালকত্ব এসেছে। না হলে এ গান এভাবে···মার মাথায় খেলছিল না কিছুতেই।
সেই আলাপ। পুরীর বিচে আরও পরিচয়। তারপর কখন এক

সময় শর্মির বাবাই বলে দিল, আনন্দ, তুমি শর্মিকে ইংরেজি আর বাংলা পড়িয়ে দাও। সায়েন্স সাবজেক্টে ও খুব পাকা। ও দুটোর উন্নতি করলে রেজাল্টটা ভাল হতো।

খুব হাওয়া উঠেছিল তখন। কিন্তু তার মধ্যেই সবাই পরিষ্কার শুনতে পেল আনন্দ বলছে, রাজি!

আর এই আনন্দকে আজ মুখ ফুটে বলতে হবে ওর আর আসার দরকার নেই। অথচ কী ভালই না পড়াচ্ছিল ছেলেটা। মার বুকটা হঠাৎ দমে গেল। শর্মিলার দিকে প্রশ্নসূচক চাহনি মেলে বললেন, কিন্তু আনন্দকে কে বলবে না আসার জন্য?

বুকের ঝড় বুকে লুকিয়ে শর্মিলা বলল, আমি বলব।

কিন্তু বলব বললেই সব কথা সবাইকে বলা যায় না। হাতে চা-জলখাবারের ট্রেটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে শর্মিলার মনে হল ওর জীবনের এইখানেই শেষ আজ। বুকের কাঁপুনি হাতে ফুটে বেরুচ্ছে। ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে ট্রে-টা। তার ওপরে বসানো কাপ-ডিশ কাঁপছে ঠন্‌ঠন্‌ করে। ওর অবস্থা দেখে আনন্দ নিজে উঠে দাঁড়িয়ে ট্রে-টা নিয়ে নিল। মুখে বলল, তোমার শরীর খারাপ, শর্মি?

শর্মিলা ঘাড় নেড়ে বোঝাল—না।

তাহলে···

হঠাৎ করে জেদি স্বরে শর্মিলা বলে উঠল, আজ থেকে আর আমি আপনার কাছে পড়ব না!

একটা ছোট্ট বজ্রপাত যেন চোদ্দ বাই দশ ঘরটার মধ্যে। আনন্দ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না এর জন্য। কীরকম অবাক, অসহায় কণ্ঠে বলল, কেন, অন্য ভাল মাস্টার পেয়েছ বুঝি?

শর্মিলা কষ্ট করে ফের সেই ঝাঁঝ এনে বলল, না কাউকে পাইনি। আমি কলকাতাতেই থাকব না। মেদিনীপুর চলে যাচ্ছি।

এবার সত্যিই বেদনা বোধ করেছে আনন্দ। ভাবছে, মেয়েটা চলে যাবে! কেন, কী মহৎ পড়াশুনো হয় মেদিনীপুরে? কিন্তু মুখে এসব কথা আসেনা ওর। শুধু কষ্টে সৃষ্টে বলল, ও!

শর্মিলা খাবারের প্লেটটা মাস্টার মশাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে মিষ্টি

করে বলল. নিন।
আনন্দ প্লেটটা নিয়ে ফের বসিয়ে রাখল ট্রে-তে। আর বলল, ঠিকই, কলকাতায় যা গণ্ডগোল, বোমাবাজি, ধর্মঘট, তোমার ভালই হবে মেদিনীপুর গেলে।
কথাগুলো ভাল মনেই বলেছিল আনন্দ। কিন্তু শর্মিলার ভেতরটা একদম খুবলে খাবলে গেল। ফস্ করে বলে বসল, অতশত জানিনা। মা চাইছে তাই যাচ্ছি।
আনন্দ আবার অবাক হয়ে বলল, মা চাইছে ? তুমি চাইছ না ?
শর্মিলা কোন উত্তর করল না। জামার বুকের ভেতর থেকে একশো টাকার নোটটা বার করে মাস্টারমশাইয়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনার টাকাটা…
আনন্দ হাত নেড়ে বলল, সে কী, টাকা কেন ? নতুন মাসে সবে তো দু'দিন পড়িয়েছি।
কিন্তু মা দিতে বলেছে।
মাকে বলো দু'দিন পড়িয়ে মাস্টারমশাই টাকা নেন না।
শর্মিলা বোকার মতো টাকাটা ফেলে রাখল ওর আর মাস্টার-মশাইয়ের মধ্যিখানের সেণ্টার টেবিলটায়। যেখানে খাবারগুলো যেমনকে তেমন পড়ে আছে, মাস্টারমশাই শুধু আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে চা-টা খাচ্ছে। শর্মিলা বলল, আপনার ঠিকানাটা লিখে দেবেন ?
আনন্দ ঠোঁট থেকে কাপ নামিয়ে বলল, টাকা পাঠাবার জন্য যদি ঠিকানা চাও তাহলে দিচ্ছি না। ও টাকা তো নেব না।
যদি চিঠি দিই ?
আবার খুব অবাক হয়ে গেছে আনন্দ। মেয়েটা ওকে চিঠি লিখতে চায়। বলল, তাহলে দিচ্ছি। কিন্তু তোমার মেদিনীপুরের ঠিকানা ?
দেব না।
সে কী কথা ! তুমি আমায় চিঠি দেবে আর আমি তার উত্তর দিতে পারব না ?
হ্যাঁ তাই ! আপনার চিঠি দেখলে দাদু ক্ষেপে যাবে।

আনন্দ খুব বোঝদারের ভঙ্গিতে বলল, ও, তাই ! বেশ।
বলে একটা কাগজ নিয়ে খস্‌খস্‌ করে নিজের নাম ঠিকানা লিখে দিল। ঠিকানাটা লেখা হতেই ওর মনে হল যেন এই বাড়ির সঙ্গেই ওর সম্পর্কটা ফুরিয়ে গেছে। কোনও পক্ষ থেকেই ওর আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। ও 'তাহলে উঠি' বলে অভিমানী বালকের মতো এক লাফে সোফা ছেড়ে উঠে বাড়ির বাইরে পা চালাল। খুব ইচ্ছে হল একবারটি ঘুরে ছাত্রীটিকে দেখে। কিন্তু দেখল না।
শর্মিলা একদৃষ্টে দেখল মাস্টার মশাইয়ের চলে যাওয়া। তারপর খাতার কিছু কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে আর টেবিলে পড়ে থাকা ডট্‌পেনটা উঠিয়ে এক দৌড়ে চলে গেল ছাদে। কান্নার বাষ্প জমছে ভেতরে, ছাদে গিয়ে কাঁদতে না পারলে কেলেঙ্কারি হবে। ও ছাদে পোঁছল যখন, তখন সবে একটা কালীপুজোর ফানুস উঠেছে অন্ধকার আকাশে। আলসেতে হেলান দিয়ে শর্মিলা ফানুস দেখতে দেখতে ভাবল, ইস ! পুজোর আট দিন পরেও ফানুস ! মেদিনীপুরে কোনদিন কেউ এরকম ফানুস দেখতে পাবে না। মেদিনীপুরে যাওয়া মানেই নতুন করে বন্দী হয়ে পড়া।
...সেখান থেকে আমাকে বাঁচাতে পারো একমাত্র তুমি। কিন্তু এখনই নয়। আগে গবেষণা শেষ করো, চাকরি নাও। যখন নিজে সংসারের হাল ধরবে তখন আমাকে নিয়ে পালিয়ে এসো কলকাতায়। তোমার বাড়িতে। কিন্তু আমার পড়া বন্ধ করো না। মা তাহলে খুব দুঃখ পাবে। আমাকে বি-এ, এম-এ সব পাশ করিও। মা-বাবার শান্তি হবে। আর তোমার কাছে এনে এমন ভাবে বন্দী করবে যেন কখনো কোথাও চলে যেতে না পারি।
আমার সব চিঠি জমিয়ে রেখো। সেই সঙ্গে তোমার লেখা উত্তর-গুলো। সেগুলো তুমি মেদিনীপুরে পাঠাবে না। তোমার কাছে বন্দী হওয়ার পর আমি সব চিঠি পাশাপাশি ফেলে পড়ব। আমার প্রণাম...ছিঃ ! আমার চুমু নিও।

তোমার, শুধু তোমার শর্মি

ছাদের টিমটিমে বৈদ্যুতিক বাতিতে চিঠিটা লিখে খামে পুরে নাম-

ঠিকানা বসালো শর্মিলা। তারপর যত্ন করে খামটা জামার ভেতর গুঁজল। বাড়িতে জিনিস লুকোবার জায়গা বলে কিছু নেই। যেখানেই রাখো ঠিক চোখ পড়বে মা'র। কাল সকাল অব্দি গোপন রাখাই সমস্যা। ইস্কুলের পথে ডাক বাক্সে ফেলতে পারলে রক্ষে।
ছাদের আলো নিভিয়ে পা টিপে টিপে নিচে নেমে এল শর্মিলা।
রাতে মার পাশে শুয়ে ঘুমের ভান করছে মেয়ে। হঠাৎ মার গলা শোনা গেল, শমি। অ্যাই শমি।
ঘুম জড়ানো কণ্ঠ নকল করে শর্মিলা বলল, কী।
তোর আনন্দকে কেমন লাগে রে?
শর্মিলা উত্তর দিল না। অভিমানে চুপ। লজ্জাতেও। মা ফের বলল, বললি না?
কী বলব?
আনন্দকে কেমন লাগে?
এ আবার কী প্রশ্ন?
বল্‌না ছুঁড়ি।
জানি না।
তা জানবি কেন?
জানতে যাবই বা কেন?
মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দীর্ঘশ্বাস কেন? কিন্তু কে জিজ্ঞেস করবে ওসব কথা মাকে। সব ব্যাপারেই সন্দেহ আর সন্দেহ। শর্মিলা মটকা মেরেই পড়ে রইল। শুনল মা বলছে, আজ বিকেলে ওর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা বলে এলাম ওর মার সঙ্গে। বলেছি মেয়ে পাশটাশ দিলে হবেখন। কিন্তু কথাটা হয়ে থাকল।
মা ফের একটা শ্বাস ফেলল। স্বস্তির।
শর্মিলার বালিশ ভিজে যাচ্ছে। চোখের জলে।
বিকেলের সেই বুক ফাটা কান্নাটা এখন নতুন এক সুর পেয়েছে। ভেতরেই বাজছে, বাইরে পরিবেশ খুব নীরব।
মা পাশ ফিরে মেয়ের চুলে বিলি কাটতে লাগলেন।

অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার কোনও চলই আমার কোনও কালে নেই। একবার যখন সত্যি সত্যি চেষ্টা করলাম কিছুটা অন্তত শিক্ষিত হওয়ার পুরো ব্যাপারটাই চোখ, মগজ আর স্মৃতি জুড়ে থেকে গেল দুঃস্বপ্নের মতো। এখন ঘটনাগুলোকে আমার "শেষ মেট্রো" অভিজ্ঞতা হিসেবে শোনাই বন্ধুদের মাঝে মাঝে।

ঘটনাগুলো ১৯৮৬ গ্রীষ্মের, লণ্ডনে। কাজে গিয়ে সেবার ছিলাম বন্ধু সুমিত আর গোপার সঙ্গে উত্তর লণ্ডনের ওকউডে। হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে যে সুদীর্ঘ পিকাডিলি লাইন ভূতল রেল সোজা চলে যায় লণ্ডনের উত্তর প্রান্তে ককফস্টার পর্যন্ত সেই লাইনে পড়ে ওকউড, ককফস্টার থেকে গুটিকয়েক স্টেশন আগে।

আমার বরাবরের যা স্বভাব সেটাই বহাল ছিল এবারও। কাজ শেষ হলে অফিস পাড়া থেকে সটান বাড়ি ফেরা সে আর হবার নয়। আমি হবর্ণ পল্লীতে কাজ শেষ করে বাস নিতাম লেস্টার স্কোয়্যার বা পিকাডিলি সার্কাসের দিকে। বিনোদনের কোটি কোটি উপকরণে সাজানো এই পাড়াগুলোতে। বেড়াতে বেড়াতে দিনের সমস্ত পরিশ্রমের অবসাদ কেটে যেত। তখন পূর্ণ মর্মে প্রকট হতো আমার কাছে ডঃ স্যামুয়েল জনসনের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি: লণ্ডনেরও সে লোক ক্লান্ত বোধ করে সে আসলে জীবনের দ্বারই ক্লান্ত। টুক করে লেস্টার স্কোয়্যারের কোনও সিনেমা হলে কোনও চালু ছবি দেখে ফেলে নয়তো পিকাডিলির কোনও পাব-এ গোটা তিনেক ড্রাফট্ বিয়ার গলায় ঢেলে আমি ফের হাঁটতে থাকতাম লণ্ডনের পথ ধরে। আমায় খুব সুখী সুখী লাগত। কখনো কখনো আমি পিকাডিলি থেকে বেকারলু লাইনের ট্রেন ধরে চলে যেতাম বন্ধু বাপীর বাড়ি ওয়ারিক অ্যাভেনিউতে। বাপী আমার কলেজ আমলের বন্ধু, এক কালের ডাকসাইটে নকশাল। এখন বিলিতি এক হোটেল চেন-এ পদস্থ কর্মী। ফি

হপ্তায় কয়েক ক্রেট কার্লসবার্গ বিয়ার পায়। আমার ওপর হুকুম জারি করেছে—শান্তনু, সাবধান! দিশি টাকা ভাঙিয়ে লণ্ডনে ফুটানি করতে যেও না। বিয়ার-হুইস্কি খাবার চেষ্টা হলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ট্রেন ধরে চলে এসো আমার ডেরায়। আমি থাকি বা না থাকি ফ্রিজ খুলে যা ইচ্ছে সাঁটিয়ে খাও। আমি থাকলে তোমার ডিনারের ব্যবস্থাটাও করে দেবখন। বলেই ওর ব্যাচেলারজ অ্যাপার্টমেণ্টের দু'নম্বর চাবির তোড়াটা আমায় দেখালো।
বাপীর ফ্ল্যাটে যাওয়াটা আমার মগজ ছাড়াবার পক্ষে ওষুধের কাজ করত। বাপী না থাকলে কয়েক পাইণ্ট বিয়ার খেয়ে আমি টিভি দেখতে বসতাম, তেমন প্রোগ্রাম কিছু না পেলে ওর রাশি রাশি রেকর্ড থেকে একটা কিছু বেছে নিয়ে স্টিরিও সিস্টেমের টার্ন টেবিলে বসিয়ে দিতাম। তাও ভাল না লাগলে একটা বই টেনে নিয়ে পড়া শুরু করতাম। এবং কোনদিনই প্রায় বাপী আসার আগে পা চালিয়ে বেরিয়ে আসতে পারতাম না। সুমিত গোপারা অনুযোগ করত বাপীর ডেরায় তুক্‌তাকের ব্যবস্থা আছে কিছু। আমি মিটিমিটি হাসতাম ওদের অনুযোগে।
একদিন বাপীর ওখানে যাব বলেই বসেছিলাম লেস্টার স্কোয়্যারের এক এক চিল্তে বাগানে। একটু আগে আগেই বেরিয়েছিলাম অফিস থেকে, পার্কে বসেছি যখন তখন হাতে ধরা দিনের "টাইমজ" পত্রিকা, এক কৌটো কোকা কোলা আর একটা হ্যামবার্গার। একটা বেঞ্চিতে বসে একটা ফিচারে মন দিতে চেষ্টা করছিলাম, মাঝে মধ্যে একটু একটু কামড় দিচ্ছিলাম হ্যামবার্গারে আর চুমুক দিচ্ছিলাম কৌটোর পানীয়ে। হঠাৎ যেন চট্‌কা ভাঙার মতো হল পাশ থেকে ভেসে আসা আওয়াজে—স্যার, দয়া করে একটু কোক দেবেন আমায়?
ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি এক পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স্ক ইংরেজ যুবক কাতর নয়নে আমার দিকে চেয়ে আছো। নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না; একটা ভদ্রসদ্র ইংরেজ যুবক এই বড়লোকী পাড়ায় দু চুমুক কোকা কোলা চাইছে এক ভিনদেশীর কাছে! নাকি ও অন্য কিছু বলেছে? ওকে তো কোনও ভাবেই ভিখিরি মনে করার

উপায় নেই। আমি আমার কৌটাটা এগিয়ে দেবার আগে নিঃসন্দেহ হবার জন্য বললাম, কিছু বললেন?
উস্‌খো-খুসকো সোনালী চুল যুবকের পরনে স্যুট আছে কিন্তু গলায় টাই নেই। মুখ শুকনো শুকনো, চোখ দুটো বসা, চোখের মণি কিছুটা যেন নিথর। ঠোঁট দুটো কথা বলার সময় একটু বেশিই কাঁপছে। ও আমার কোকা কোলার টিনটার দিকে নির্দেশ করে কীরকম ব্যাকুল একটা স্বরে বলল, খুব তেষ্টা পেয়েছে। একটু চুমুক দিতে পারি আপনার কৌটায়?
এঁটো কৌটা অচেনা একজনকে বাড়িয়ে দিতে পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনাকে একটা কৌটা এনে দিচ্ছি। যুবক ম্লানভাবে তাকিয়ে রইল আমার আমি মিনিট খানেকের মধ্যে একটা কোকা কোলার কৌটা কিনে এনে ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম। আর কৌটা হাতে পাওয়া মাত্র যুবক যেভাবে মুখ লাগিয়ে গাঢ় চুমুকে খেতে লাগল যেন কোনও তরল পদার্থ পান করছে না ও, শক্ত কোনও খাবারই খাচ্ছে। আমার মনে হল লোকটার তেষ্টার চেয়েও বেশি পেয়েছে খিদে। আমি প্রায় নিজের অজান্তেই কখন হাতের হ্যামবার্গারটা এগিয়ে দিয়েছি ওর দিকে আর ও সেটা গ্রহণও করেছে কৃতজ্ঞ চিত্তে। আমি আমার কাগজটা খুলে ফের পড়ায় মন দিলাম।
কিছুক্ষণ পর ফের সেই মিনতি—স্যার! থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ইণ্ডিড! কিন্তু ধন্যবাদ জানার কোনও সময় নেই আমার, আমাকে এবার রওনা দিতে হবে বাপীর বাড়ির দিকে। তবু ঘাড় ঘোরালাম; দেখি যুবক অনেকখানি এগিয়ে এসেছে আমার পাশে। আর বলছে, আজ দিনের প্রথম খাওয়া এটা আমার। মাথা ঘুরছিল তার আগে।
কেন, কী বৃত্তান্ত জানার কোনও কৌতূহল নেই তবুও স্বভাব-বশেই হয়তো জিজ্ঞেস করে ফেললাম, কেন? কী হয়েছিল? যুবক মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, দু মাস হ'ল চাকরি ছাড়া আমি। অ্যাদ্দিন বৌয়ের আয়ে চলছে, কিন্তু আজ মাথা গরম করে বসেছে বৌটা।

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় বলে বসলাম, করতেই পারে। কিন্তু আপনার চাকরিটা গেল কেন? যুবক একটা অবসন্ন মুখ করে বলল, আমারই দোষে। আমি কাজে কামাই করে ফেলছিলাম।
বললাম, কিন্তু কেন?
আমার এইরকমই হয়। দিন রাত সব তালগোল পাকিয়ে যায়। একেক সময় ভুলে যাই যে আমারও একটা চাকরি আছে? তার সময় আছে, নিয়মকানুন আছে।
পেটের খিদেটার কথা মনে থাকে? বাড়ির ঠিকানা? কথাগুলো বলেই ভেতরে ভেতরে লজ্জিত হয়ে পড়লাম। না হয় একটু হ্যামবার্গার আর একটু কোক খেতে দিয়েছি, তাতে এরকম খোঁচা দিয়ে কথা বলার অধিকার জন্মায় না। সঙ্গে সঙ্গে আগের কথা-গুলোর সংশোধনী হিসেবে বলে ফেললাম, ঝগড়া যা হবার হয়েছে, তা বলে বাড়ি ফিরছেন তো?
যুবক মাথা নেড়ে বোঝাল 'হ্যাঁ', তারপর বিষণ্ণ বদনে উল্টো দিকে মুখ করে বসে রইল। আমার বুঝতে বাকি রইল না যে ফেরার কড়িও পকেটে নেই ওর। তাই জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় থাকা হয়?
যুবক আমতা আমতা করে বলল, বেশ দূরেই। গোল্ডার্স গ্রিন। আমি যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলাম, ফেরার ভাড়া আছে? যুবক মাথা নেড়ে বোঝাল—না।
কিন্তু আমার ততক্ষণে সন্দেহ শুরু হয়েছে। ব্যাটা কি আমাকে ভালোমানুষ ভারতীয় পেয়ে জক্ দিচ্ছে? না একে ক্যাশকড়ি দেওয়া নেই। যদি টিউবে যায় তো টিউবের টিকিটই কিনে দোব। তারপরই খেয়াল হ'ল যে গোল্ডার্স গ্রিন পর্যন্ত টিউব নেই। এক জায়গায় উঠে এসে বাস অথবা সার্ফেস ট্রেন নিতে হয়। কিন্তু তাহলেও আমি ওর টিউব অংশের টিকিট কেটে দিতে চাই। নো ক্যাশ বিজনেস। কে জানে ওই পয়সা দিয়ে হয়ত মদ গিলবে! আমি যুবককে লেস্টার স্কোয়্যার থেকে হাঁটতে হাঁটতে নিয়ে গেলাম পিকাডিলি সার্কাস। তারপর নিচে নেমে দু দুটো টিকিট কাটলাম। আমার টিকিট বাপীর পাড়া ওয়ারিক অ্যাভেনিউর,

ওর টিকিট গোল্ডার্স গ্রিনের কাছাকাছি একটা স্টেশন। ওকে ওর টিকিটটা দিয়ে আমার ট্রেন ধরতে অন্য একটা সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নামতে লাগলাম। যুবকের জন্য আর একটা সেকেন্ডও ব্যয় করার ইচ্ছে আমার নেই।
আমি ট্রেন অবধি এসে পড়েছি। ট্রেনের দরজা খুলে গেছে। আমি ঢুকব বলে তৈরি। হঠাৎ আমার হাতের ওপর একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম। ঘুরে দেখি যুবকের শীর্ণ, শীতল হাত। আর চোখে বিন্দু বিন্দু জল। ধরা গলায় বলছে, আপনার এই সহৃদয়তার কোনও মূল্য হয় না, স্যার। আপনি শুধু আমার ক্ষুধাই মেটাননি, আপনি আমাকে বিশ্বাস করে সম্মানিত করেছেন। আমি কি আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে পারি?
আমার বুকটা হঠাৎ খুব উষ্ণ হয়ে উঠেছে। নিজের ওপর কিছুটা শ্রদ্ধা জন্মেছে। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। যুবক দু'হাতে আমার হাতটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর আমার টাইবাঁধা শার্ট কলারে আলতোভাবে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, গড্ ব্লেস ইউ! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! আমি ট্রেনে চড়ে পড়েও দেখলাম যুবক মুগ্ধ, কৃতজ্ঞ চোখে দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে।
ঘটনাটা শুনেই এক অট্টহাসি জুড়ে দিল বাপী। শালা, শেষে একটা ড্রাগ অ্যাডিক্টের পাল্লায় পড়লি? দুনিয়াময় লোক থাকতে সবাই এসে তোকে ধরে কেন? মুখে কী প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে ঘুরিস ব্যাটা? ওটা তো নিরেট ড্রাগখোর! আমি প্রতিবাদ করে বললাম, কেন, ড্রাগ অ্যাডিক্ট কি মানুষ নয়? ওদের কি অভাব থাকতে পারে না? নাকি……
আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে বাপী বলল, ওরা মানুষও বটে, অভাবীও বটে। আবার চিটিংবাজও। লোককে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে পয়সা খেচায় ওদের দারুণ ট্যালেন্ট। আর ওদের পাল্লায় পড়ার ট্যালেন্ট নিয়ে জন্মেছ তুমি। আমি আর কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ মেরে গেলাম। বাপী আমার হাতে একটা বিয়ারের ক্যান ধরিয়ে দিল। এর দিন আষ্টেক পর বাপীর ফ্ল্যাটে ডিনার

সেরে টিউবে করে পিকাডিলি সার্কাস এসেছি, ট্রেন বদলে আমার ওকউডের আস্তানায় যাব। সঙ্গে বাপীও এসেছে আমাকে শেষ মেট্রো ধরাবে বলে। যা মিস হলে ওর সঙ্গেই ফের ফিরে যেতে হবে ওর ডেরায়। কিন্তু কপাল ভাল শেষ ট্রেন তখনও ছাড়েনি। ছাড়ব-ছাড়ব ভাব। আর কামরার পর কামরা ধু-ধু, খাঁ-খাঁ। হঠাৎ একটা কামরায় ঢুকতে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মিনিটের জার্নি, অথচ নিঃসঙ্গভাবে যেতে হবে। একবার ভাবলাম ফিরে আসি, কিন্তু পিছু ঘুরে চলার আগেই এগিয়ে ঢুকে পড়েছি ট্রেনে।

শেষ মেট্রোয় ঢুকে পড়ে ভেতরের সমস্ত ভয়-ভীতিগুলো টের পেতে থাকলাম। গুণ্ডা-বদমায়েস-লম্পট মাতালের ভয়, নিঃসঙ্গতার ভয়, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যার অতীত আত্মা প্রেতাত্মার ভয়। আমি প্রথম কয়েক মুহূর্ত সিটের সামনে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম, সামান্য চেষ্টায় ধপাস্ করে বসে পড়তে পারলাম না। যখন শেষমেশ বসে পড়তে পারলাম আমার বুকটা ধড়াস্ করে উঠল নতুন এক দৃশ্যে। আমার সিটের উল্টো দিকে এক তরুণ ইংরেজ দম্পতি! ওরা দম্পতি, এটা হঠাৎ আমার মনে হ'ল কেন? এটা ভাবতেই কারণটা মাথায় এসে গেল। ওরা খালি কামরা পেয়ে আপন মনে প্রেম করে যাচ্ছে। না, ভুল বললাম! দুজনেই সমান তালে প্রেম করছে না। ছেলেটি সিটের দুই হাতলে হাত রেখে সামনের দিকে পাথরের মতো লক্ষ্যহীন, নিস্পন্দ চোখে তাকিয়ে আছে। প্রেম ও আদরে পারতপক্ষে ও কোনও ভূমিকাই নিচ্ছে না। যা কিছু করার করে যাচ্ছে সঙ্গিনীই।

সঙ্গিনী ওর সমস্ত গাল মুখ জুড়ে চুমো দিয়ে যাচ্ছে। দুটি আবেগ-মথিত হাতে আদর দিচ্ছে ওর চুলে, মুখে, বুকে, কাঁধে হাতে। এক প্রস্তরমূর্তিকে যেন জাগ্রত করার সমস্ত প্রয়াস চালাচ্ছে। মেয়েটির নিজের চোখ দুটি বিস্ফারিত, জ্বলজ্বলে, আবেগে ভরপুর। প্রেমিকাকে চুমো দিতে দিতে মিষ্টি মিষ্টি কথাও বলে যাচ্ছে মৃদু স্বরে। একেক সময় নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে আসছে প্রেমিকের কোলে। তারপর ফের ফিরে যাচ্ছে নিজের জায়গায়।

আর নতুন করে শুরু করছে আদর।
কিন্তু ছেলেটি যেমন আছে তেমনিই রইল। কোনও আবেগেই রা কাড়ছে না, উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই তার মধ্যে। অত সুন্দরী একটি যুবতী অত চেষ্টাতেও প্রাণের সাড়া আনতে পারছে না হতভাগার মধ্যে! বলতে নেই, হতভাগা নিজেও ভারী দৃষ্টিনন্দন চেহারার মানুষ। বয়স বড় জোর কুড়ি-বাইশ। নীল চোখ, টিকোল নাক, সরু ঠোঁট, সোনালি চুল আর মুখের সবখানটায় একটা নিষ্পাপ ভাব। কিন্তু ওই সুন্দর, নীল চোখে ও কিছুই দেখছে না কেন? ও কি পাগল? ও কি জড়বুদ্ধি? ও কি মৃত!
আমার হঠাৎ ভীষণ ইচ্ছে করল উঠে গিয়ে ঠকাস্ করে একটা চড় কষিয়ে ছোকরার সম্বিৎ ফিরিয়ে দিই। যাতে মেয়েটির আদর আর সোহাগের মূল্য টের পায়। না হলে ওরকম হাবাগোবার মতো ……আমি জিভ কাটলাম, এ কি! ওরা কী করছে, না করছে তা নিয়ে আমার কী মাথা ব্যথা? লজ্জা পাওয়ার পর রাগের মর্মটাও বুঝলাম—ছোকরাকে আমি হিংসে করতে শুরু করেছি!
মেয়েটি দেখলাম উঠে দাঁড়িয়েছে আর হাত ধরে দাঁড় করাচ্ছে সঙ্গীকে। তারপর ট্রেন দাঁড়াতে ছেলেটিকে ধরাধরি করে নেমে গেল স্টেশনে। আমি জানালার বাহিরে চোখ চালিয়ে দেখলাম স্টেশনটা ফিনসবেরি পার্ক। আপনার থেকে ভেতরে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল—সর্বনাশ! ফিনসবেরি পার্ক! চোর-গুণ্ডা রাহাজানিকার-দের মুক্তাঞ্চল। তার মধ্যে এই ল্যাবা ছেলেটাকে নিয়ে নির্বিঘ্নে পার হতে পারবে মেয়েটা? যার-তার খপ্পরে পড়ে লুঠ হবে না তো!
ওরা একটা সাংঘাতিক উপকার কিন্তু করে গেল আমার। খালি কামরার লৌকিক-অলৌকিক ভয়গুলো একদম ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিয়ে গেল। ওদের রকমসকম নিয়ে ভাবতে ভাবতে কখন ওকউড পেঁৗছে গেলাম আমি। আর সরস বৃত্তান্ত হিসেবে গুছিয়ে ব্যাপারটা বলতে না বলতেই সুমিত আর গোপা সমস্বরে বলে উঠল, সে কী মশাই, অতক্ষণ ধরে দেখেও ঠাওর করতে পারলেন না সে ছোকরা ড্রাগ অ্যাডিক্ট? ওরাই তো দেশটার মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে

সারাক্ষণ। চাকরি করবে না, বাকরি করবে না, শুধু সোশ্যাল সিকিউরিটির টাকায় মদ আর ড্রাগ চালিয়ে যাবে। ওদেরকে করুণা দেখানোর কোনওই মানে হয়না। প্লিজ বি কেয়ারফুল, ওদের জন্য সহানুভূতি খরচ করতে যাবেন না।

বলা বাহুল্য, সুমিত আর গোপার সতর্কবাণী আমি এতই নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম যে তার পরের দিনের শেষ মেট্রোতে আমি আমার পাশে বসা তরুণীটির কথাগুলোও স্পষ্ট করে শুনছিলাম না। জানি না, অতিরিক্ত বিয়ার পানের জন্যই কি না আমার শ্রবণশক্তিও যথেষ্ট ভাল কাজ করছিল না। আমার মাঝে মধ্যেই মনে হচ্ছিল কেউ একটা কিছু বলছে আমাকে, কিন্তু মাথা ঘুরিয়ে, কান খাড়া করে সেটা শোনার চেষ্টাটাই কিছুতে করে উঠতে পারছি না। ঝাপ্‌সাভাবে শুনলাম নারীকণ্ঠে আমায় জিজ্ঞেসা করা হচ্ছে, আর ইউ এশিয়ান ? আমি মাথা না ঘুরিয়ে উত্তর দিলাম, ইয়েস। ইণ্ডিয়ান।

ফের প্রশ্ন—আপনার নাম ?

নেশা জড়ানো গলায় বললাম, জানা খুব দরকার ?

উত্তর এলো—দরকার নেই, কিন্তু জানতে ইচ্ছে করছে।

আমি "শান্তনু চ্যাটার্জি" নামটা ঘোষণা করতে করতে পাশে তাকিয়ে ভুত দেখার মতো আৎকে উঠলাম। আমার পাশে কালকের রাতের সেই প্রেমিকা মেয়েটি। আমি বোধ হয় উত্তেজনায় বিচিত্র কোনও আওয়াজই করে বসেছিলাম কারণ মেয়েটি ওর তর্জনীটা আমার ঠোঁটের ওপর এনে নিজের ঠোঁটটা ছুঁচলো করে ধ্বনি করল "শ্‌া শ্‌া শ্‌া শ্‌া শ্‌া !"

ততক্ষণে আমার বিয়ারের চট্‌কা কেটে গেছে, আমি চোখ বড় করে আশেপাশে চেয়ে দেখলাম আজকের শেষ মেট্রোতে শুধু এই কামরায় প্যাসেঞ্জার অন্তত বারো জন। আমার খেয়াল হল এটা শুক্রবার সন্ধ্যে পরের দুটো দিন ছুটি। লণ্ডন এখন মস্তির ব্রাহ্মমুহূর্তে। আমি মেয়েটির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে কোনরকম ভূমিকা না করেই বললাম, তোমার সঙ্গীটি কোথায় ?

মেয়েটিও কোনও ভূমিকা না করে বলল, হাসপাতালে।

হাসপাতালে! আঁতকে উঠেছি আমি। হাসপাতালে কেন?
মেয়েটি বলল, ওর নার্ভের রোগ। ডাক্তার বলছে সারা কঠিন। তাও আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি যদি সারাতে পারি। কাল ওকে পিকাডিলিতে বেড়াতে এনেছিলাম।
ওর কথাতেই মালুম হ'ল মেয়েটি কাল অত প্যাশনের মধ্যেও আমাকে নজর করেছে। কখন আড়চোখে কী দেখল তা আমিও জানিনা। বড় কথা, আমার মুখটাও মনে রেখেছে। হঠাৎ সেই সন্দেহটা চাগাড় দিয়ে উঠল—বৈঠকবাজ, চিটিংবাজ মেয়েছেলে নয় তো? আমি নিজের সিটে আরেকটু সোজা হয়ে বসলাম।
জিজ্ঞেস করলাম, ছেলেটি তোমার বর? মেয়েটি উত্তর করল, না, বন্ধু।
বন্ধু!
হ্যাঁ, এসেছিল খদ্দের হয়ে। তারপর ফিরে যায়নি। আমি আরও একবার তড়িতাহত হয়েছি। —তার মানে…তার মানে…তুমি… তুমি…মেয়েটি আস্তে করে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, তাই।
জিজ্ঞেস করলাম, এখনও? মানে ওর সঙ্গে……
মেয়েটি বলল, হ্যাঁ। বস্তুত ওর জন্যই……
আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, বুঝলাম!
মেয়েটি আমার শরীরের দিকে আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলল, কিন্তু আরেকটু বেশি বুঝতে হবে।
কীরকম?
আজকে আমি আপনাকে চাই। কাল যেমন আপনি আমাকে চাইছিলেন।
আমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে উঠলাম, কী করে বলছ তুমি একথা? মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, আমরা মেয়েরা সেটা বুঝতে পারি। সেজন্যই তো নিথর পাথর প্রেমিকটির সঙ্গে আমার অত ঘটা করে অত কিছু করা!
তার মানে…তার মানে তুমি অত সব করছিলে…
হ্যাঁ, আপনাকে পাগল করে তুলতে। আমি হতাশ হয়ে বললাম, তাও তো করে ফেলেছিলে। আমি তো ছোকরাকে হিংসের বশে

চাঁটি মারতে উঠছিলাম প্রায়।
মেয়েটি একটু ম্লান কিন্তু মৃদু হাসি হেসে বলল, তাহলে?
আমি বললাম, তাহলে আর কী? তোমার টাকার দরকার, এই নাও কুড়িটা পাউন্ড। আমার সোয়েটার কেনার টাকা। আমার সোয়েটার থাক, তুমি ওর চিকিৎসা করাও।
মেয়েটি কিন্তু টাকা নিল না। বলল, আমার ঘরে অন্তত দশ মিনিট না বসে ওই টাকা দিলে আমি নেব না। আমি জানালার বাইরে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম ফিনসবেরি পার্ক এসে গেছে। তাই বললাম, আচ্ছা চলো।
স্টেশনে নেমে একটা গা ছমছমে ব্যাপার কিন্তু হ'ল। ফের ঠগের পাল্লায় পড়লাম ভেবে ভয়-ভয় ভাব হ'ল। ঘুরে ট্রেনে চড়ে বসব কিনা ভাবছি, দেখলাম ট্রেন প্ল্যাটফর্ম থেকে সরতে শুরু করেছে। ফিনসবেরি পার্কের গোটা স্টেশন সংলগ্ন পাড়াটাই নাকি বিভীষিকাময়। তাই বাইরে বেরিয়েই মেয়েটি যখন আমার ডান হাতটা ধরল ওর বাঁ হাত দিয়ে আমি হাত না বাড়িয়ে পারলাম না। ততটা প্যাশন নয় যতটা সঙ্গ পাওয়ার বাসনায়। মেয়েটি একটা গর্বিত হাসি হেসে বলল, ভয় নেই, এখানে আমায় সবাই চেনে। চোর-গুন্ডারও আমার সঙ্গীদের ওপর চড়াও হয় না।
শুনে স্বস্তি হ'ল আমার, কিন্তু হাতটা ছাড়লাম না। মেয়েটি ফের বলল, শেষ ট্রেন গেল তো কী হল? আমি আপনাকে ট্যাক্সি ধরিয়ে দোব। আর বেশিক্ষণ বসাবও না।
শেষ কথাটার যেন খোঁচা খেলাম আমি। বেশিক্ষণ বসাব না মানে? টাকা যখন দিচ্ছি আমি চাইলে সারা রাতও বসতে পারি। বসব না সেটা আমার মর্জি।
স্টেশন চত্বর পার হয়ে বড় রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা গিয়ে একটা গলি ধরল মেয়েটি। আমি হাত ছাড়িয়ে ওর পিছন পিছন যেতে থাকলাম। গলির অপর প্রান্তে পেঁছে ডান দিকে বাঁক নিয়েই একটা বাড়ির গেটে চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাতে লাগল। আমি ওর পিছনে দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে ভাল করে দেখতে লাগলাম। টিপিক্যাল লাল ইঁটের কটেজ-টাইপ বাড়ি। তবে কটেজ টাইপ বাড়ির

সামনেটায় যেমন বাগানের জায়গা থাকে তেমন কিছু নেই। রাস্তার ওপরেই দরজা। মোটা, ভারী পেতলের কড়া বসানো ভারী খয়েরি কালো মেহোগেনি দরজা।

কিন্তু ওই দরজা খুলতেই যত বিপত্তি। দরজা খুললেই ডান হাতে একটা সরু করিডর, আর সামনে একটা খাড়া কার্পেটমোড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। কিন্তু সিঁড়ি অবধি যাওয়ার আর সুযোগ হ'ল না, তার আগেই ডান দিক থেকে জনা চারেক লোক এগিয়ে এল কঠিন গলায় হাঁকতে হাঁকতে—জেনি! জেনি! ইউ কাণ্ট গো আপ। উই ওয়াণ্ট এ ওয়র্ড উইথ ইউ।

এই প্রথম জানলাম মেয়েটির নাম জেনি। মেয়েটি যে বেশ নির্ভীক ধরণের তার পরিচয় এতক্ষণে কিছুটা পেয়েছি, কিন্তু ও যে এতটাই বেপরোয়া ভাবিনি। এগিয়ে আসা ষণ্ডা মার্কা লোকগুলোকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে আমার ডান হাতটা সে পাকড়াও করে তরতরিয়ে উঠতে লাগল দোতলায়। আমার ধারণা হ'ল নিচের লুম্পেনগুলো পাড়ার ছোকরা, মদ বা ড্রাগের পয়সার জন্য অপেক্ষায় আছে। আবার ভাবলাম, অবাঞ্ছিত লোক হলে বাড়ির ভেতরে ঢুকল কার দাক্ষিণ্যে? কিন্তু দোতলায় জেনির নিজের ঘরটাই বা নিরাপদ কীসে? দরজা ঠেলতে দেখা গেল এক সম্ভ্রান্ত চেহারার প্রৌঢ় ইংরেজ ভদ্রলোক হাতের ওয়াকিং স্টিকটা থাইয়ের ফাঁকে গুঁজে বসে আছেন ঘরের একমাত্র সোফাটায়। ভদ্রলোককে দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল জেনি—কী! আপনি ফের এসেছেন এখানে? কে ঢুকতে দেয় আপনাকে দিনের পর দিন?

গোঁফের তলায় মিটি মিটি হাসতে হাসতে ভদ্রলোক বললেন, তোমার মা, অবশ্যই!

জেনি বিরক্তিতে ভেঙ্গে পড়ে বলল, ওঃফ্ মা! কবে সে মহিলা শিখবে কাকে বাড়িতে ঢোকানো যায়, কাকে যায় না! ভদ্রলোক জেনির এই কথাটার কোনও গুরুত্ব না দিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করতে এগিয়ে এলেন। মুখে বললেন, আমি ডাঃ রিচার্ড অ্যাপেলগ্রিন, জেনিদের পারিবারিক বন্ধু......

আমি নিজের নাম বলার আগেই পাশ থেকে জেনি গর্জে উঠল, রাবিশ্ ! পারিবারিক বন্ধু না ছাই ! ওঁর একমাত্র পরিচয় উনি অ্যালফ্রেডের বাবা। অ্যালফ্রেডকে কাল আপনি ট্রেনে দেখেছেন। আমার বন্ধু, আমার স্বামী……

ডোণ্ট ইউ এভার সে দ্যাট এগেন ইন মাই প্রেজেন্স ! প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ডাঃ অ্যাপেলগ্রিন। আমার পরিবারের ছেলের সঙ্গে তোমার বিবাহ কখনও সম্ভব নয়, জেনি। এই শেষ বারের মতো তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, জেনি। এবার বলো আমার ছেলে কোথায়, নয়তো সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যাব। আমি চার-চারটে গুণ্ডা সঙ্গে করে এনেছি।

ডাঃ অ্যাপেলগ্রিনের কথার কোনও প্রভাব জেনির ওপর পড়ল বলে মনে হ'ল না। ও ডাঃ অ্যাপেলগ্রিনের ক্ষোভের জবাবে ঢের বেশি ক্ষোভ জড়ানো কণ্ঠে বলল, আপনার পরিবারের কী অমর্যাদা হবে বা হবেনা তা নিয়ে আমার এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই। আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা অ্যালফ্রেড, যাকে আমি ভালবাসি, যাকে আমি বাঁচাতে চাই। আপনার পুত্রকে আপনি স্নেহ আর বৈভবের মধ্যে পালন করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন। ওকে চরম জাতের ড্রাগ অ্যাডিক্ট বানিয়েছেন। ও যেদিন প্রথম আমার কাছে এসেছিল সেদিন থেকে আজ অবধি আমাদের কোনও দেহ সংসর্গ হয়নি। কারণ তা করার কোনও দৈহিক অবস্থাই অ্যালফ্রেডের নেই। প্রথম রাতেই ও আমার কাছে আবেদন রেখেছিল, আমাকে বাঁচাও ! আর বিয়ের প্রস্তাব আমি ওকে দিইনি, দিয়েছে ও আমাকে। আর এখন যখন আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি আমার পিছিয়ে আসার কোনও উপায় নেই। রিচার্ড অ্যাপেলগ্রিন রাগে, ক্ষোভে, অসহায়তায় কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে বসে পড়লেন সোফাতে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন, তুমি বুঝতে পারছ না জেনি অ্যালফিকে সারিয়ে তুলতে কত অর্থ, কত যত্নের প্রয়োজন। তোমার কোত্থেকে সে সঙ্গতি হবে ? জেনি ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, আমার টাকা নেই ঠিকই কিন্তু ভগবানের দেওয়া এই সুন্দর শরীরটা আছে। অ্যালফিকে ভাল করতে এ দিয়ে সব যা করতে হয় আমি করব। কারও কাছে হাত পাততে যাব

না। আর যত্নের কথা তোলার কোনও অধিকারই আপনার নেই। কোনও যত্ন আপনারা কোনদিন ছেলেটাকে দেননি। ডাঃ অ্যাপেলগ্রিন বললেন, তাই বলে তোমার মতো একটা মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়েতে আমাকে সম্মতি দিতে হবে?

আপনার সম্মতির অপেক্ষায় তো আমরা নেই। উই আর হাসব্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়াইফ ইন দ্য নেম অফ ক্রাইস্ট। থামাও তোমার নাম-কীর্ত্তন! চেঁচিয়ে উঠলেন ডাঃ অ্যাপেলগ্রিন। তুমি আমার অসুস্থ ছেলেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কব্জায় রেখেছ, আর ধর্মীয় মতের বিয়ের কথা বলছ। তুমি ছেলে হলে আর অ্যালফি মেয়ে হলে তোমাকে অপহরণের অপরাধে জেলে পাঠাতাম।

জেনি হাসতে লাগল! বলল, তাও পারতেন না। আপনার বংশের বদনাম হতো না, আপনাদের শ্রেণীতে মর্যাদা খুব ঘুরে ফিরে আসে, ভালবাসা কথাটা একেবারেই অবর্তমান। অ্যালফির যদি ভাল চান তো আমার কাছ থেকে ওকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা বন্ধ করুন। আমি ওকে ছাড়ব না, না, না!

জেনি কথা শেষ করতে পারেনি যখন দীর্ঘদেহী প্রৌঢ় উঠে গিয়ে ওকে চুল ধরলেন, চল্ তবে বেটি! চল্ কোথায় রেখেছিস আমার ছেলেকে। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন……

জেনি ওর চুল ছাড়াতে এলোপাথাড়ি লাথি, ঘুঁষি ছুঁড়তে লাগল, কিন্তু বড়সড় চেহারার ডাক্তারটি ছাড়বার পাত্র নন। মেয়েটিকে ঘর থেকে হেঁচড়ে বার করে সিঁড়ির মুখে ফেললেন, তারপর গলা ছেড়ে ডাকতে লাগলেন ওঁর গুণ্ডাগুলোকে। কিন্তু ততক্ষণে ভূতে ভর করেছে আমায়।

সোফায় ফেলে রাখা ডাক্তারের ছড়িটা তুলে দিয়ে চার-পাঁচটা কড়া ঘা লাগিয়ে দিয়েছি প্রৌঢ়ের পিঠে আর হাতে। ভদ্রলোক চিৎ হয়ে পড়েছেন মাটিতে, জেনি একটা লাথিও কষে দিয়েছে ওঁর কোমরে। কিন্তু রে রে করে ততক্ষণ সিঁড়ি দিয়ে বেয়ে উঠে এসেছে গুণ্ডা-গুলো। চকিতের মধ্যে জেনির শোবার ঘরের সামনেটা একটা রণক্ষেত্র। মারামারি, চেঁচামেচির মধ্যে শুনতে পেলাম এক প্রৌঢ়ার কণ্ঠ। সম্ভবত জেনির মার। কিন্তু আমার আর কোনদিকে

ভ্রূক্ষেপ নেই। ডাক্তারের লাঠি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি ডাক্তারের গুন্ডাগুলোকে।
আমি জ্ঞান হারাবার আগে শেষ কথা যেটা শুনেছিলাম তা হ'ল জেনি কেঁদে কেঁদে মিনতি করছে কার কাছে, ওকে নয়, ওকে নয়, ওকে নয়, আমাকে মারো। ওকে ছেড়ে দাও প্লিজ! আমার জ্ঞান ফিরতে দেখলাম আমি রক্তাক্ত শরীরে একটা ট্যাক্সিতে বসে। ড্রাইভার বলল যে চার-পাঁচজন লোক ধরাধরি করে আমায় তুলে দিয়েছে গাড়িতে। ড্রাইভারকে পাঁচটা পাউণ্ড দিয়ে বলেছে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। ছোকরা ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছিল আপনার?
বললাম, তেমন কিছু না। মদের আড্ডায় মারামারি।
তা কোথায় যাবেন এখন। থানা না হাসপাতাল?
বললাম, বাড়ি।
সেটা কোথায়?

গিলোটিন

'রাজার রক্ত কখনো দেখেছ, ছোকরা?' কাঠের ভারী বাক্সটা আমাদের সামনে নামিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রমহিলা। আমি ওঁর প্রশ্নের উত্তর দেবার কোনও উৎসাহই বোধ করলাম না, কারণ রাজরক্ত দূরে থাক, আমি জীবনে কোনও জ্যান্ত রাজাই দেখিনি। আর, তাছাড়া, ভদ্রমহিলার প্রশ্ন করার মধ্যে কীরকম একটা তাচ্ছিল্যের ভাবও ছিল। আমার পাশে বসা বন্ধু আর্মান্দোও দেখি কোনও উচ্চবাচ্য করছে না।

ভদ্রমহিলা বাক্সর ডালা খুলতে খুলতে ফের বললেন, 'আর্মান্দো বলেছিল তুমি ভারতীয়। ভারত তো শুনেছি রাজা-রাজড়ার দেশ। ওঁদের কোতল করা হয় না?'

আমি আগের মত চুপই থাকলাম। আর্মান্দো শিস দিয়ে একটা ফ্লামেঙ্কো সুর ভাঁজতে লাগল। ভদ্রমহিলা বাক্সের ডালা খুলে আরেকটা কাঠের বাক্স বার করলেন। তারপর সেটা খুলে আরেকটা। তারপর সেটা খুলতে খুলতে নিচু স্বরে বললেন, 'সঙ্গে কত এনেছ?' বুঝলাম টাকার কথা বলছেন। আর্মান্দো আমায় আগেই শিখিয়ে রেখেছিল। সেই মতন বললাম, 'পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক।'

ভদ্রমহিলা দড়াম করে শেষ বাক্সটার ডালা চাপা দিয়ে দারুণ হতাশার সঙ্গে বললেন, 'ম' দিউ! হা ভগবান! আর্মান্দোটা কি কোনদিনও একটা পয়সাওয়ালা লোক ধরে আনতে পারবে না? কেউই দেখি পঞ্চাশ-ষাট ফ্রাঙ্কের ওপর ওঠে না।'

এবার পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার জন্য আর্মান্দো তাড়াহুড়ো বলে বসল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি খেলা দেখাও মাদাম। রাজীব আমার বন্ধু, এটা আমার দিন। বাড়তি যা লাগে আমি দেব।'

ভদ্রমহিলা ম্লান হেসে বললেন, 'ব' ! বেশ ! তাহলে আমি শুরু করছি।' বলে হাতের ছোট্ট বাক্সটা এমনভাবে মেপে মেপে খুলতে লাগলেন যেন ওর ভেতর ওঁর প্রাণভোমরা। ফাঁক পেলেই উধাও হবে।

আমার মনে পড়ল প্যারিসের স্যাঁ জর্ম্যা পল্লীর ওই কাফেটা যার কাচের দেওয়ালের পাশে বসে আমি জিপসি জাদুকরের করাতের খেলা দেখি। আগুন গেলা দেখি। ময়লা কাগজ থেকে নোট বানানো দেখি। ওই জিপসিও কাঠের বাক্সে মুর্গি রেখে করাত চালাবার আগে খুব নকশা করে ওর করাত নিয়ে। বলে, 'করাত আমার মন্ত্রপড়া। যা-ই কাটুক, রক্ত গড়াবে না। সব রক্ত ও পান করে নেয়।'

আমি ওই করাতটাই এক মনে দেখছিলাম যখন কাফের ওয়েটার আর্মান্দো আমার লাল ওয়াইনটা টেবিলে এনে সশব্দে রাখল। আর তাতেও আমার ঘোর কাটেনি দেখে বলল, 'এমনও করাত আছে মঁসিয়র যা মানুষের রক্ত পান করে।'

আমি চমকে উঠে বলেছিলাম, 'সে আবার কী ?'

আর্মান্দো খুব বিজ্ঞের মত বলেছিল, 'গিলোটিন।'

ওর বুদ্ধির দৌড় দেখে হতাশার সুরে শুধু বলেছিলাম, 'ও !'

এর দু'দিন পর একটু বিকেল-বিকেল গিয়েছিলাম 'কাফে ব্রে জোলি'-তে এক পাত্র কালো কফি খেতে। গিয়ে বসেওছিলাম সেই পূর্বেকার জায়গায় যখন আর্মান্দো দৌড়ে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে নামানো স্বরে, 'তুমি তুমি' করে বলতে শুরু করল, 'তুমি আমার কথাকে পাত্তাই দিলে না সেদিন। কিন্তু সত্যিই তোমাকে আমি গিলোটিন আর রাজার রক্ত দেখাতে পারি।'

ওর এই অবান্তর কথায় যে কোনও বিশ্বাসই আমার হয়নি তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ওর এই 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে আসাটা আমার ভাল লেগেছিল। কবে যেন বলেছিল যে ও স্পেনের ছেলে, এখানে বয়গিরি করে পয়সা জমাচ্ছে ছবি আঁকার ইস্কুলে ভর্তি হবে বলে।

বলেছিলাম, 'আর্মান্দো, তুমি বোধহয় জানো যে মাথা কাটা

যাওয়ার মত রাজা ফ্রান্সে অন্তত আর নেই। আর গিলোটিন…'
আর্মান্দো আমাকে কথা শেষ করতে দেয়নি। আমার কথার মধ্যেই বলে বসল, 'তোমাকে সেই ষোড়শ লুইয়ের রক্তই আমি দেখাব।'
নিরুপায় হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর সেই দুশ বছর আগের গিলোটিনটাই বুঝি…' এবারও আমাকে কথা শেষ করতে দেয়নি আর্মান্দো। বলতে লাগল, 'না, সে গিলোটিন নয়। তবে এটারও একটা ইতিহাস আছে।'
'কীরকম ?'
'শ দুয়েক ফ্র্যাঙ্ক নিয়ে সামনের শনিবার বিকেলে এখানে চলে এস। তারপর সন্ধ্যেটা কীভাবে কাটে দেখ।'
আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'তুমি ভাল করেই জান যে আমি গরীব ভারতীয় ছাত্র। একটা বুজরুকি দেখার জন্য দু'শটা ফ্র্যাঙ্ক আমি উড়িয়ে দিতে পারি না।'
আমার 'বুজরুকি' শব্দের ব্যবহারে একটু যেন আঘাত পেয়েছিল ও। ক্ষণিকের জন্য চুপ করে গেল। তারপর প্রায় দ্বিগুণ উৎসাহে বলে গেল, 'গুলি মারো দু'শ' ফ্র্যাঙ্ককে। যা পারো আনবে। কিন্তু দরদস্তুরের সময় পঞ্চাশের বেশি উঠবে না। বাকি যা, আমি সামলাব।'
আমি আর 'হুঁ', 'না' কিছুই করতে পারিনি। কিন্তু রাজরক্ত দেখার জন্য রওনা হওয়ার সময় পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছিলাম দু'শ ফ্র্যাঙ্কই।
আমার ঘোর কাটল গলা থেকে পা অব্দি কালো গাউনে মোড়া মাদাম সঁস-র জোরালো কণ্ঠস্বরে, 'তাহলে এই দেখ ষোড়শ লুইয়ের রক্ত!' আমি চমকে উঠে দেখি ভদ্রমহিলার হাতে একটা ছেঁড়া জিরজিরে ঘিয়ে রঙের সিল্কের স্কার্ফ। কালচে কালচে ছোপে ভরা। মাদাম সঁস সেটাকে স্টেজের জাদুকরের মত মেলে ধরে বলে যাচ্ছেন, '১৭৯৩ সালের ২১ জানুয়ারি যে ষোড়শ লুইকে গিলোটিনে হত্যা করা হয় তাঁর রক্তে চোবানো এই কাপড়। সেদিনের জল্লাদ, শার্ল সঁস, আমার পিতৃপুরুষ, আরও অনেকের

সঙ্গে স্মৃতি হিসেবে কুড়িয়ে নেন কিছু রাজরক্ত। এভাবে—' বলে স্কার্ফটা রুমালের মত হাওয়ায় দোলাতে লাগলেন ভদ্রমহিলা। উনি বোধহয় করতালির প্রত্যাশায় ছিলেন, যা দুজনার কেউই আমরা উপহার দিলাম না ওকে। উনি খানিকক্ষণ এভাবে স্কার্ফ নাড়ানাড়ি করে সেটা ছুঁড়ে দিলেন বড় কাঠের বাক্সে। মুখে বললেন, 'গোল্লায় যাক রাজা!' আমি নিজের মনে বিড়বিড় করে বললাম, 'ভেড়ার রক্ত' আর্মান্দো খুব রহিস আদমি ঢঙে অর্ডার করল, 'মাদাম, ওয়াইন লাগাও।' ওয়াইনের তলবে আমি দেখলাম মাদামের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। আনন্দে।
এবার মাঁদামও একটা শিস দিলেন, এক ঝটকায় ওঁর বসার টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যালে নর্তকীদের ভঙ্গিতে নৃত্যের পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার পথে বড়সড়, কিন্তু মলিন বসার ঘরের গোটা দুয়েক বাতি নিভিয়ে দিয়ে গেলেন। পুরনো, ধুলো পড়া, কমলালেবু রঙের শেড দেওয়া একটি মাত্র আলো জ্বলতে থাকল। বাইরের অন্ধকারটাকেই যেন ঘরের ভেতর টেনে এনে ঘরটাকে মোহময় করে তোলা হল। আমি বুঝে পেলাম না গিলোটিনের সঙ্গে এরকম একটা পরিবেশের কী সম্পর্ক। স্ত্রাসবুর্গ স্যাঁ দনি-র এই বাড়ি তাহলে আশপাশের আর পাঁচটা বনিতাগৃহের থেকে আলাদা কিসে?
কিন্তু পরিবেশটা আমার ভালও লাগছিল। গিলোটিনটাকে নিছক এক টোপ মনে করে ভুলে যেতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। মাদাম ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আর্মান্দো জিজ্ঞেস করল, 'রাজীব, তুমি ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস কিছু জান?
বললাম, 'কিছু কিছু।'
'রাজার জল্লাদের নাম সত্যিই কি স্যঁস?
বললাম, 'হ্যাঁ।'
আর্মান্দো চুপ করে গেল। আমি সেণ্টার টেবিলের অ্যাশট্রেটা সোফার হাতলের ওপর তুলে নিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরালাম। ফ্ল্যাটের ভেতরকার করিডরে একটা তৎপরতা শুরু হয়েছে মনে হল। একটা দুটো ঘড়ঘড় আওয়াজও কানে এল। আর্মান্দো ঠাট্টা করে

বলল, 'তোমার গিলোটিন নামানো হচ্ছে।' যা শুনে আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না। আমার হাসি থামতে আর্মান্দো ফের বলল, 'জল্লাদদের বংশের ওপর নিয়তির একটা অভিশাপ থাকে। তাই না?'
বললাম, 'কী জানি! ওই সব অভিশাপ-টভিশাপ বুঝি না। হঠাৎ একথা মনে হলই বা কেন?'
এবার আর্মান্দো ওর কড়া হাভানা চুরুট ধরাতে ধরাতে বলল, 'তা না হলে মাদাম সঁসঁ-র মত ডাকসাইটে সুন্দরীকে বেশ্যা হয়ে যেতে হয় কেন? আর তাতেও বা ওঁর এই হাল হয় কেন?'
মাদাম সঁসঁ আদৌ জল্লাদ শার্ল সঁসঁ-র বংশধর কিনা আমি 'জানি না। রাজার রক্ত নিয়ে ওঁর এই বুজরুকিতেও আমার কোনওই বিশ্বাস নেই। কিন্তু মহিলা যে প্রকৃতই সুন্দরী ছিলেন কোনও এক সময় এবং এই প্রৌঢ় বয়সেও যে তিনি রীতিমত চোখকাড়া এটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসেনি কেন? আসলে আমি মনে মনে বাসনা পুষে রেখেছি যে স্কার্ফের রক্তটা রাজার রক্তই হোক, যদি গিলোটিন কিছু থেকে থাকে এখানে সেটা যেন সত্যিকারের গিলোটিনই হয়। সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবছি যে সত্যিকারের গিলোটিন তো প্রকাণ্ড বস্তু, সে এই ফ্ল্যাটের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকবে কী করে? আমি কি সত্যি সত্যি একটা গিলোটিন দেখার আশা করছি এখনও? আর সেই কারণে খেয়ালও রাখছি না যে প্রৌঢ়া মাদাম সঁসঁ সত্যিই কি সুন্দর? হলেও বা বেশ্যা।
এই সব আকাশপাতাল ভাবছিলাম যখন ট্রে-তে করে দু বোতল ওয়াইন আর খান তিনেক গেলাস নিয়ে ঘরে ঢুকল একটা বছর চৌদ্দ-পনেরর ছেলে। ওর হাতের ওই ট্রে, ওই গেলাস, ওই বোতল সব কিছুরই একেকটা বৈশিষ্ট্য আছে। আর্মান্দো বলল, 'মাদাম দাম একটু বেশিই নেন ঠিকই, কিন্তু ওয়াইন দেন খাসা।' কিন্তু আমি সব ছেড়ে কেবল নজর করছিলাম ছেলেটাকে। একটা অদ্ভুত, যাত্রা দলের পোশাক ওর পরনে। ও টেবিলে ট্রে-টা নামিয়ে রাখতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নাম কী?' উত্তর এল 'অঁরি সঁসঁ।' মনের গভীরে কোথায় যেন একটা ঘণ্টি বাজতে শুনলাম—অঁরি

সঁস···অঁরি সঁস···অঁরি সঁস···তারপর হঠাৎ খেয়াল হল, হ্যাঁ তাই তো! ইতিহাসের জল্লাদ শার্ল সঁস-র ছেলের নামও ছিল অঁরি। আমি একটা-দুটো ঢোক গিলতে গিলতে বললাম, 'কিন্তু তোমার এই পোশাক? কোনও ফ্যান্সি ড্রেস পার্টিতে যাচ্ছ বুঝি?' বালক বোধ হয় এত ইনিয়ে বিনিয়ে কিছু জানানোর পক্ষপাতী নয়। ও আমাকে চুপ মারিয়ে দেবার জন্যই সম্ভবত খুব সাফা করে শুনিয়ে দিল, 'এটা জল্লাদের পোশাক। যখন গিলোটিনের দড়ি টানি আমি এটাই পরি।' কোথায় গিলোটিন, কার গিলোটিন, কে টানে, কে মরে কিছুই বুঝলাম না। রকমসকম দেখে একদম চুপ মেরে গেলাম। আর্মান্দো পকেট থেকে পাঁচ ফ্র্যাঙ্কের একটা কয়েন বার করে ছেলেটার হাতে গুঁজে দিল। ও 'মের্সি' বকু, অনেক ধন্যবাদ' বলে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর তখনই এক মস্ত বড় কাঠের ট্রে হাতে করে ঘরে ঢুকলেন মাদাম সঁস। ঠোঁটে পূর্বের সেই শিসের ধ্বনি, আর ট্রে-তে খাবার নয়, ডজনখানেক কাটা মুণ্ডু।

আমি শিউরে উঠে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, আর্মান্দো আমাব হাত ধরে টেনে বসাল। শুনলাম বলছে, 'অত ভয়ের কিছু নেই, ওগুলো মোমের মাথা।' আমি নিজেও নিশ্চয়ই ভাবিনি ওগুলো মানুষের মুণ্ডু, কিন্তু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম মাদামের ওগুলো বয়ে আনার কায়দা দেখে। গা-টা শিরশির করতেই থাকল যখন দেখছি মাদাম একেকটা মাথাকে ফুলদানি সাজানোর ঢঙে পিয়ানোর ওপর ঠক ঠক করে রাখছেন। সেই সঙ্গে সুর করে করে বলছেন, এটা রাজা লুই, এটা রাবি মারি অঁতোয়ানেৎ, এটা মাদাম রোলঁ, এটা শার্লৎ কর্দে, এটা কামিল দেমুল্যাঁ, এটা ওঁর সুন্দরী স্ত্রী লুসিল, এটা ভের্নিয়ো, এটা অর্লেয়ঁ, এটা দঁতঁ, এটা স্যাঁ জুস্ত্, এটা রোবসপিয়ের······

আর্মান্দো আমায় কনুইয়ের খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করল, 'এসব কী বলে যাচ্ছে মাদাম?' আমি বললাম, 'বিপ্লবের গিলোটিনে নিহতদের নাম।' আর্মান্দো বলল, 'ঠিক বলছে?' উত্তর দিলাম, 'ভুল তো কিছু বলেননি দেখছি।' তখন মাদামের জন্য গলা উঁচিয়ে বলল, 'আমি

কি গেলাস ভরতে শুরু করব প্রিয়তমা ?' মাদাম ওঁর মুণ্ডু সাজানো শেষ করে আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, 'খুবই বাধিত হই তাহলে।' কথাটা বলার সময় ওঁর গাউনটা দুহাতে আলতো করে তুলে ধরে পা ভাঁজ করে বাও করলেন ভদ্রমহিলা। আর অমনি একটা ওয়াইনে ভরা গেলাস তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে আর্মান্দো নাটকীয়ভাবে টোস্ট করল, 'মাদামের গিলোটিন আর যৌন ক্ষমতা দীর্ঘজীবী হোক!' আমাদের তিনজনের মিলিত, জোরালো হাসিতে ভরে গেল মাদাম সঁস-র জীর্ণ, মোহময়, আলো-আঁধারি ছায়া বসার ঘর।

সবে তিন গেলাস করে ওয়াইন শেষ হয়েছে, মাদাম শুরু করলেন তাঁর মাতাল কথাবার্তা। 'জানো রাজীব, আমি জল্লাদ বাড়ির মেয়ে। জীবনে দুটো জিনিসই চেয়ে এসেছি। বুক ভরে মদ খেতে আর পুরুষের দ্বারা ধর্ষিত হতে। মদ প্রচুর পেয়েছি, কিন্তু তেমন পুরুষ পেলাম কজন ? যে আমাকে ছিঁড়েকুটে মাংসের দলা বানিয়ে দেবে। সারা গায়ে কালশিটে পড়বে, এখান ওখান থেকে রক্ত ফুটবে। কিন্তু আমি জানব আমি স্বর্গে যাচ্ছি। আমার শরীরের প্রত্যেকটা রোমকূপ থেকে আনন্দ আর তৃপ্তি ঝরবে।'

এইবার উঠে দাঁড়িয়েছে আর্মান্দো। বলছে, 'কিন্তু আমি তোমাকে সেই আনন্দ দিয়েছি আদেল। মিথ্যে বল না। রক্ত ঝরাইনি, কিন্তু, কিন্তু'—আর্মান্দো হাতের গেলাস নামিয়ে এক লাফে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মাদাম সঁসঁকে। কিন্তু তার আগেই নিজের হাতের গেলাসটা নামিয়ে রাখা হয়ে গেছে মাদামের! আর্মান্দোর এই আদিখ্যেতা বোধ হয় আঁচ করেছিলেন তিনি। ওঁকে জড়িয়ে ধরে যখন গালে গাল ঘষতে যাচ্ছে ছোকরা মাদাম এক ঝটকায় ওকে পাশের দিভানে ছিটকে ফেললেন। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে শাসনের সুরে বললেন, 'খদ্দেরকে ঠকানো যায় না ছোকরা। মদ আর চুম্বন অপেক্ষা করতে পারে। আমি জল্লাদ ঘরের মেয়ে, আমার কাছে গিলোটিন আগে।'

মাদাম হনহনিয়ে হেঁটে গিয়ে বসার ঘরের এক প্রান্তের দেওয়াল-জোড়া সিল্কের পর্দা স্টেজের স্ক্রিন টানার মত করে টেনে টেনে দুফাঁক করে খুলে দিলেন। আর আমি হাঁ হয়ে দেখলাম একটা

মস্ত কাঠের গিলোটিন ফ্ল্যাটের ছাদ ফুটো করে ওপরের অ্যাপার্ট-মেণ্ট পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। একটা সত্যকার, ভয়ঙ্কর কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো, ভয়াল করাতযুক্ত গিলোটিন! যার হাড়িকাঠে কারও মাথা ঠেলে দিয়ে দড়ি টানলেই ত্বরিৎ, বেদনাহীন নরহত্যা।

আমি আমার সোফা ছেড়ে উঠতে গিয়ে দেখলাম আমার পা দুটো লোহার মত ভারী। আমার ওঠা হল না। একটা ডুপ্লেক্স বা দ্বিতল অ্যাপার্টমেণ্টকে কাটিয়ে এভাবে মাদাম একটা রোমহর্ষক বিনোদনের ব্যবস্থা ফেঁদেছেন। যা আদৌ আইনসঙ্গত কিনা ঈশ্বর জানেন। মাদাম সুইচ টিপে ঘরের একমাত্র বাতিটাও নিভিয়ে দিলেন। তারপর আরেকটা সুইচ টিপে জ্বেলে দিলেন একটা ফোকাস ল্যাম্প। যাতে পরিপূর্ণ ভাস্বর হয়ে উঠল গিলোটিন ও তার শ্বাসরোধ করা নৃশংসতা। মাদামের ঝটকা খেয়ে বিরক্ত আর্মান্দো বলে উঠল, 'শালা খুনী মাগী!' কিন্তু মাদাম ওর কথায় কান দিলেন না। স্টেজে দাঁড়ানো অভিনেত্রীর ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, 'বন্ধুগণ! এ হল একটা সত্যকার গিলোটিন। আমার এক পিতৃপুরুষ রাতের অন্ধকারে একে এনে তুলেছিলেন এখানে। মানুষ বলির জন্য নয়, স্মৃতি হিসেবে। বেআইনী এই যন্ত্র পোষার জন্য হেন বেআইনী কাজ নেই যা তিনি করেননি। এ আমাদের পরিবারের গর্ব। একে দেখতে আসেননি এমন অভিজাত নেই শতাব্দীকাল আগের প্যারিসের। একে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টাও কম হয়নি। এর সবচেয়ে বড় বলি আমি, মাদাল আদেল সঁস, যে পরিবারের সমস্ত ধন ও তার নিজের শরীর ঘুষ হিসেবে উজাড় করে দিয়েছে আইনের ধারক-বাহকদের। ফলে আজও এই যন্ত্র মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে স্ত্রাসবুর্গ স্যাঁ দনির এই কুখ্যাত গলিতে।'
আমি পঞ্চাশের জায়গায় এক শ ফ্রাঙ্ক বার করে হেঁটে গেলাম মহিলার দিকে। ওঁকে টাকা দিতে উনি সেটার দিকে দৃকপাতও করলেন না। শুধু ডাকলেন 'অঁরি! অঁরি!' দুবার। দেখি সেই ছেলেটা একটা বালতি নিয়ে ছুটে এসেছে। এনে রাখল হাড়িকাঠের নিচে। তারপর পিয়ানোর ওপর থেকে রাজার মুণ্ডুটা এনে পাতল

গিলোটিনের গর্তে। হঠাৎ চোখি পুরনো পোশাকে একটা ষোল-সতের বছরের মেয়েও চলে এসেছে ঘরে। মাদাম ওকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ে ক্লোদিন।' ক্লোদিন গিলোটিনের মঞ্চে উঠে গিয়ে হাঁটু গেড়ে মাথা নুইয়ে বসল। ওর চুল আর রাজার মুণ্ডুর মধ্যে ইঞ্চি দেড়েক ব্যবধান। মাদাম উঁচু গলায় গাইতে লাগলেন ফরাসীদের জাতীয় সঙ্গীত 'লা মার্সেইয়াজ'। জল্লাদবেশী বালক অঁরি গিয়ে দড়ি টেনে বসল—ঝপাং! আর সঙ্গে সঙ্গে এক রক্ত হিম করা আর্তনাদ ক্লোদিনের। রাজার মুণ্ডু ঠস করে পড়ল বালতির ভেতরে পাতা জালে। মাদাম সঁস গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'রাজা খতম!'

এই খেলা আমি কীরকম উপভোগ করেছিলাম জানি না, কিন্তু আমার অজান্তেই আমার হাত দুটো জোরে জোরে তালি দিয়ে উঠল। আর্মান্দো ওর ওয়াইনের গেলাস তুলে ধরে চিৎকার করে উঠল, 'ভিভ লা রেপুবলিক! গণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক! দীর্ঘ-জীবী হোক মাদামের খেলাঘর!' মাদাম একটু লাজুকভাবে বাও করলেন, ওঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের বাও করল ক্লোদিন ও অঁরি। নাটকের দুই পাত্রপাত্রী। মাদাম ওঁর গাউনের পকেট থেকে আমার দেওয়া এক শ ফ্রাঙ্কের নোটটা বার করে দেখলেন। দেখে ঠোঁট কুঁচকে বললেন, 'পা বকু। যথেষ্ট নয়।' আমার পকেটে আর দুটো পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের নোটের একটা বার করে আমি ওঁর হাতে গিয়ে গুঁজে দিলাম। মাদাম হেসে বললেন, 'এবার কার মুণ্ডু চাই?' পিছন থেকে আর্মান্দো চেঁচিয়ে বলল, 'রানির!' আমি বললাম, 'কারও নয়। যথেষ্ট। এবার শুধু ওয়াইন খেতে খেতে আপনার কথা শুনব।' আর্মান্দো ফের বলল, 'আমরা অনেক অনেক ওয়াইন খাব। তারপর মাদামকে গিলোটিনে চড়াব!' ঘরসুদ্ধ সবাই আমরা হাসতে লাগলাম। মাদাম ঘরের বাতি জেবলে ফোকাশ ল্যাম্প নিভিয়ে দিলেন। ক্লোদিন স্ক্রিন টেনে দিয়ে রাজার মুণ্ডসুদ্ধ বালতি নিয়ে চলে গেল। যাবার মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে, ফের একটা বাও করে অঁরি বলল, 'বঁ সোয়ার! শুভসন্ধ্যা!' আমি আমার ওয়াইন ঢালতে লাগলাম।

আমি আর আর্মান্দো এক মনে মাদামের গল্প শুনছিলাম, খেয়ালই করিনি ক্লোদিন কখন এসে কিছু রুটি, চিজ আর সার্ডিন রেখে গেছে। মাদাম বলেছিলেন, 'এই গিলোটিন আর মারণাস্ত্র নয়, এটা প্রেমের যন্ত্র। কত ফরাসীই যে আছে যারা ভয় না পেলে দৈহিক মিলনে যেতে পারে না। তাদের ডাক্তাররা তাদের ঠেলে পাঠায় আমার কাছে। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের ব্যাপার কী জান? ওরা ভয় পাবার পর আরও ভয় পেতে চায়, মেয়েদের হাতে মার খেতে চায়। তুমি আইনের কথা বলছ, কত বড় বড় নগরকোটালরা এককালে এখানে এসে উদোম হয়ে মার খেয়ে গেছে আমার মেয়েদের হাতে। এক ছিলেন পুলিস কমিশনার যে নিজেকে মার্কি দ্য সাদের অবতার ভাবতেন। মার্কি দ্য সাদের নাম শুনেছ তো?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

মাদাম ফের শুরু করলেন, 'সে ভদ্রলোকের নাম থেকে সেডিজিম কথার উৎপত্তি। অন্যকে নিপীড়ন করে নিজের রতিবিলাস। তো সেই কমিশনার যখন-তখন দ্য সাদ হয়ে পড়তেন। তিনি বাড়ির বৌ, ঝি পিটিয়ে ক্ষান্ত হতেন না, চলে আসতেন আমার এখানে। মেরে লণ্ডভণ্ড ক'রে ফেলতেন আমাকে। তারপর মার খাবার জন্য শুয়ে পড়তেন এই মেঝেতে...' মাদাম আঙুল দিয়ে ফায়ারপ্লেসের পাশে ছেঁড়া কার্পেটের দিকে দেখালেন। দেখিয়ে চোখ বুজে বললেন, 'উনি ছিলেন আমার সেরা প্রেমিক। এসব ওঁর রেখে যাওয়া চিহ্ন...' বলতে বলতে গায়ের গাউনের পিছনের বোতাম-গুলো পটাপট খুলে ফেললেন। তারপর হাতা দুটো ছাড়িয়ে গাউনটা নামিয়ে আনলেন কোমরের কাছে। আমি দেখলাম প্রৌঢ় বয়সেও অসম্ভব দৃঢ় দুটি স্তন মাদামের, অন্তর্বাসে ক্ষীণভাবে ধরা। মাদাম আঙুল রাখলেন বুকের মাঝখানে, ব্রা টেনে ধরে বাঁদিকের স্তনে, তারপর নাভির খানিকটা ওপরে। কালো কালো, পোড়া পোড়া ক্ষত সেখানে। মাদাম বললেন, 'ও দাঁত দিয়ে আমায় কাটত, চুরুটের আগুন দিয়ে পোড়াত। আর আমি...আমি ওর বুকের লোম একটা একটা করে ছিঁড়ে নিয়েছিলাম। জীবনে একবারই আমরা সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছিলাম, যার চিহ্ন আমার মেয়ে ক্লোদিন।'

মাদাম চট করে গেলাস তুলে ওঁর সপ্তম ওয়াইনটা গিলে ফেললেন। তারপর রুমাল বার করে চোখে টিপে ধরে বললেন, 'ও উন্মাদ আশ্রমে কাটিয়েছিল জীবনের শেষ কটা দিন।'

মাদাম এবার সশব্দে কাঁদতে লাগলেন। আর্মান্দো সম্ভবত ওর দশম ওয়াইনটা শেষ করে মাদামের পাশে বসে ওঁকে জড়িয়ে ধরল। পকেট থেকে দুটো একশ ফ্রাঙ্কের নোট বার করে ওঁর ব্রা-র মধ্যে ঠেসে দিল। তারপর এক হেঁচকায় খুলে ফেলল অন্তর্বাসটা। তারপর গাউনটা সরিয়ে নিল শরীরের নিম্নভাগ থেকে। আর মুখে বলতে থাকল, 'না, সে পুলিস কমিশনার মরেনি। আমিই সেই কমিশনার এতিয়েন। আমিও পাগল। তোমার জন্য। তোমার এই ঘরই আমার পাগলা গারদ।' আমি দেখলাম, 'দু'জনে দু'জনের বাহুবন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ছে। আমি আমার সাত নম্বর ওয়াইনের গেলাস খালি করে ফ্ল্যাটের দরজার দিকে পা বাড়ালাম। খাবারগুলো যেমনকে তেমন পড়ে রইল টেবিলে।
আমি ফ্ল্যাটের দরজার নব ঘুরিয়েছি, এবার টানব। একটা ছোট্ট, নরম হাত এসে পড়ল আমার হাতে। ঘুরে দেখি ক্লোদিন। ও বোধ হয় কাঁদছিল, কিন্তু ওর চোখে একটা হিংস্রতাও আছে। বললাম, 'আমি যাচ্ছি।' ও ঠোঁট বেঁকিয়ে, প্রায় ঘৃণার সঙ্গে বলল, 'তুমি পুরুষ নও?'
'এখনও জানিনি।'
'তাহলে দেড় শ ফ্রাঙ্ক দিয়ে ছেলেভুলনো খেলা দেখতে এসেছিলে?'
বুঝতে পারলাম না কী উত্তর দেব ওর। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ক্লোদিন আমার হাত ধরে টান দিয়ে বলল, 'এসো।' আমি বাধ্য ছেলের মত ওর পিছন পিছন ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার করিডর দিয়ে এক খুপরি শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।
সেখানে পাশাপাশি দুটো ছোট্ট লোহার খাট পাতা। একটায় লেপ মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে অঁরি। বেডল্যাম্পের আলোয় ওর নিষ্পাপ মুখটা আরও সুন্দর লাগছে। আমাকে আঙুল দেখিয়ে ওর খাটেই বসতে বলল ক্লোদিন। তারপর বালিশের তলা থেকে দেড় শ ফ্রাঙ্ক বার করে বলল, 'এই নাও তোমার টিকিটের দাম!'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'টিকিটের দাম কিসের?'
ক্লোদিন বাঁকা সুরে বলল, 'কেন, খেলা দেখতে আসনি?'
তারপর টাকাগুলো আমার কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এ পাড়ার অন্য কোথাও গিয়ে পুরুষ হও। রুগী আর পাগলরাই শুধু আসে এ বাড়িতে। কেউ ভালবাসতে জানে না, নারীর স্পর্শের প্রয়োজন কারও নেই। সব পাগল, আমার মায়ের মত।' ক্লোদিন নিজের কোলে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল। আমি ওর কাছে সরে এসে ওর মাথায় হাত রাখলাম, 'জল্লাদের বাড়ির মেয়েরা কি কাঁদে?'
'কে জল্লাদের বংশের!' ফোঁস করে উঠল ক্লোদিন। 'আমাদের চোদ্দ পুরুষের কেউ জল্লাদ ছিল না। ওটা মার উন্মাদ ধারণা। যা করে বাবাকে তাড়িয়েছে, দিদিদের বেশ্যা বানিয়েছে, কতকগুলো খেলনা বানিয়ে একটা ভুতুড়ে সংসার তৈরি করেছে। আমার এক দিদি এখন পাগলা গারদে, আমি আর অঁরিও পাগল হয়ে যাব শিগগির।'
'কিন্তু কেন?'
'কারণ মা'র ধারণা মা জল্লাদ শার্ল সঁসঁ-র বংশধর। তাই মিস্ত্রি ডেকে ওই বীভৎস খেলনাটা বানিয়ে এই জীবন শুরু করেছে।'
'কিন্তু আসলে উনি কে?'
খানিকটা চুপ থেকে শেষে ক্লোদিন বলল, 'প্যারিসের প্রাক্তন পুলিস কমিশনার জঁ ফ্রঁসোয়া এতিয়েনের প্রাক্তন স্ত্রী। বাবার চাকরি গেছে মা'র জন্য। বাবা উন্মাদ আশ্রমে গলায় ফাঁস দিয়েছিল পাজামার দড়ি দিয়ে।'
আমি টাকাটা ফের ফেরত দিলাম ক্লোদিনকে। জিজ্ঞেস করলাম, যারা এখানে আসে তারা তোমাদের চায় না?'
চাইবার ক্ষমতাও নেই ওদের। যেমন তোমার বন্ধু আর্মান্দো। ওরা মাকে, আমাকে মারে। নয়ত চায় আমরা ওদের মারি।'
হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার ভেসে এল বসার ঘর থেকে। আর্মান্দো ও মাদাম সঁসঁ, থুড়ি, এতিয়েন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। বোঝা গেল না কে কাকে প্রহার করছে। প্রায় স্বগতোক্তির মত ক্লোদিনকে বলতে শুনলাম, 'ফলে আজও আমি কুমারী।' তারপর হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল, 'মঁসিয়র, তুমি এবার যাও।'

কিন্তু আবার যাবার কোনও উপায় নেই। আমাকে আমার পুরুষত্ব প্রমাণ করতে হবে। আমি ক্লোদিনকে জাপটে ধরে ওর জামা টেনে টেনে খুলতে লাগলাম। রোগা, অপুষ্ট, নিষ্পাপ চেহারা। কিন্তু বিবস্ত্র করতে দেখি গায়ে চাগা চাগা প্রহারের চিহ্ন। কালশিটেতে ছেয়ে আছে পিঠ, বুক, নিতম্ব। কিন্তু তারই মধ্যেই এক নিষ্পাপ ফুলের বিভা। আমি ওর দেহটাকে বিছানায় ঠেসে ধরে বেডল্যাম্প নিভিয়ে দিলাম। ও ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ করল, 'কী করছ কি তুমি ? জান আমি সত্যিই কুমারী ?'

অন্ধকারে বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে একে একে জ্যাকেট, টাই, ট্রাউজার ছাড়তে ছাড়তে বললাম, 'তাই করছি, জল্লাদরা যা করে। আমি কুমারীর রক্তপাত ঘটাব।' তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম মেয়েটার ওপর। সে সমানে হাত-পা ছুঁড়ে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকল। অথচ আমি অপেক্ষায় আছি সতীচ্ছদ ছিন্ন করার। যখন রক্তে বিছানা ভাসবে।

কিন্তু, কিন্তু, আমার শ্বাসরোধ হচ্ছে কেন ? একটা সরু দড়ির মত কী যেন চেপে বসছে গলায়। আমি ক্লোদিনের স্তনের থেকে হাত তুলে এনে পিছনের আততায়ীর হাত চেপে ধরলাম। সরু লিকলিকে দুটো হাত, কিন্তু জল্লাদের শক্তি তাতে। আমি গোঙরাচ্ছি বেদনায়, কিন্তু নিজের শব্দও পুরোপুরি শুনতে পাচ্ছি না। তারই মধ্যে অস্পষ্ট আরেক চিৎকার, 'ভগবানের দোহাই, ওকে ছেড়ে দাও অঁরি, লক্ষ্মী ভাই আমার। এ আমার খদ্দের নয়, একমাত্র প্রেমিক। আমি ভালবাসি ওকে। দোহাই তোমার অঁরি ! অঁরি ! অঁরি !'

আমি আর বুঝতেও পারছি না আমি হাড়িকাঠে না প্রেমিকার রক্তাক্ত জঙ্ঘায়…

হারাকিরি

দরজাটা আমি পুরোটা খুলিওনি, ডোর-চেন সাঁটা থাকায় যতটুকু যা ফাঁক। দেখলাম আমার দরজা খোলার প্রতীক্ষায় আগে থেকেই কোমর ভাঁজ করে, মাথা যথাসম্ভব নুইয়ে, টিপিকাল জাপানি 'বাও'-এর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন এক প্রৌঢ়। মাথার চাঁদি টাকটা জ্বলজ্বল করছে। সাধারণ জাপানিদের তুলনায় কিছুটা মলিন স্যুট পরা ভদ্রলোকর হাতদুটো সামনে জড়ো করা। একটা লম্বাটে, কালো, বেহালার বাক্স-গোছের কিছু একটা হ্যাণ্ডেল দু'হাতে ধরা। আমি ইংরেজিতে 'ইয়েস ?' বলার পরেও কিছুক্ষণ প্রৌঢ় ওইভাবেই মাথা নিচু করেই থাকলেন।

শুধু ওর পাশ থেকে (দরজার সরু ফাঁক থেকে এতক্ষণ দেখতেই পাইনি) আমার ঘরের যুবতী চেম্বার মেডটা ছুঁচলো, বাঁশির মতো কণ্ঠে বলল, গেস্ট !

গেস্ট ? মানে অতিথি ? আমি একটু অবাকই হয়েছি মেয়েটির এই কার্যকর ইংরেজি জ্ঞানে। গত দেড়সপ্তাহ ধরে কম হ্যাপা পোহাতে হয়নি এই চেম্বার মেডগুলোকে নিয়ে। এদের কাউকে দিয়ে এক বর্ণ ইংরেজি বলানো যে কী অসম্ভব ব্যাপার তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। 'হ্যালো', 'হাই !' আর 'বিউটিফুল' ছাড়া কোন ইংরেজি শব্দ এরা শিক্ষা করেনি। জানালা খুলে দিতে বললে টিভি চালিয়ে দেয়, অ্যাশট্রে সাফ করতে বললে টয়লেট থেকে তোয়ালে এনে দেয়, লেখার কাগজ চাইলে খবরের কাগজ নিয়ে হাজির করে।

কিন্তু এখন এই আগন্তুককে দেখিয়ে দিব্যি বলে দিল গেস্ট। শুধু বুঝলাম না কার গেস্ট, কেন আসা, কী বৃত্তান্ত। আমি তবুও আর কথা বাড়ালাম না কারণ ইংরেজি বলে অধিকাংশ জাপানির সঙ্গেই দেখি বিশেষ সুবিধে হয়না। ডোর-চেনটা আলগা

করে দরজাটা পুরো মেলে দিয়ে সামান্য বাও করে বললাম, কাম ইন।
মাটির থেকে মাথা তুলে হাসি-হাসি মুখে প্রৌঢ় ত্বরিত পায়ে ঘরে ঢুকে এলেন। ঢুকে এক চিলতে হোটেল-রুম মাথা ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। একটু যেন বা হতাশই হলেন—এত ছোট রুম! আমি মনে মনে বললাম, নিজের দেশটা নিজে চেনো না? টোকিওর বুকে এই একরত্তি বিজনেস হোটেলের ঘর-ভাড়া রাত প্রতি চার হাজার টাকা! অপিসের টাকা না হলে নগদ নগদ ডলার ফেলে এমন ঘরে কেউ মরতে আসে!
কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়েছেন প্রৌঢ়। হোঁচট খেয়ে হলেও মোটামুটি পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন, মহাশয় কবে ফিরে যাবেন টোকিও থেকে?
আমি ভাবলাম, সে কথায় ওঁর কী দরকার? মুখে বললাম, কেন?
প্রৌঢ় বললেন, তাহলে একটু ব্যবসার কথা বলতাম।
আমি ভুরু কপালে তুলে বললাম, আমি গরীব সাংবাদিক। কোম্পানির টাকায় কোম্পানির কাজে ঘুরছি। আমি ব্যবসা করার লোক না। আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন।
প্রৌঢ় গম্ভীর হয়ে কথাগুলো শুনে শেষে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগলেন। বললেন, না, না, এটা তেমন কিছু ব্যাপার না। বাড়ি ফেরার মুখে হাতে একটু পয়সা থাকলে একটা দারুণ জিনিস সঙ্গে করে ফিরতে পারতেন।
দারুণ জিনিস? টোকিওতে এক কাপ কফি দোকানে বসে খেলে আমার দিশি টাকায় খরচ পড়ে পঁচাত্তর টাকা। কদিন ধরে এর-তার অতিথি বনে ডিনার সাঁটছি, ফাঁক পেলে ম্যাকডোনাল্ডের হ্যামবার্গার চিবিয়ে লাঞ্চ সারছি, আর সেই আমি দারুণ জাপানি দ্রব্য কিনে বাড়ি ফিরব! লোকটা কি খেপেছে? ভারতীয়দের অবস্থা-টবস্থার খোঁজ রাখে না? নাকি ধরতেই পারেনি আমি কোন্ দেশী?
আমি আমতা আমতা করে বললাম, না, দারুণ জিনিসে আমার কাজ নেই। আমার পকেটে দারুণ কিছু পয়সা নেই। আপনি আসতে

পারেন।
প্রৌঢ় তো নড়ার নাম করলেনই না, উল্টে আমার রাইটিং ডেস্কের ওপর হাতের লম্বা বাক্সটা যত্ন করে শুইয়ে রেখে পাশের চেয়ারটা টেনে আরাম করে বসলেন। আর বসেই সেই মিটিমিটি হাসি। দেখলাম ভদ্রলোকের খান-দুয়েক দাঁত সোনার, বাকিগুলো তামাকে ছেদলা পড়া। তিনি পকেট থেকে ছোট্ট একটা তামাকের পাউচ বার করে একটা সিগারেট রোল করলেন। করে আমার দিকে বাড়ালেন, প্লিজ !
আমি বিরক্তি চেপে না রেখেই বললাম, নো, থ্যাঙ্ক ইউ ! প্রৌঢ় তখন সেটা নিজেই ধরিয়ে বসলেন। প্রথম সুখটানটা থেকেই বুঝলাম জলতেষ্টা পাবার মতো তামাকের পিপাসা ধরেছিল তাঁকে। সরু, লম্বা একটা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শেষে বললেন, কিন্তু আপনি কী হারাবেন সেটা অন্তত একবারটি দেখুন।
আমি বলতে যাচ্ছিলাম 'অতশত দেখার আমার সময় নেই' কিন্তু ভদ্রলোকের কথাটা কীরকম আর্ত আবেদনের মতো শোনাল। তাতে আমার মুখের কথাটা সাময়িক আটকে রইল আর আমি নরম করে ঘুরিয়ে কথাটা বলতে যাওয়ার আগেই দেখি তিনি তাঁর ওই লম্বা, কালো, বেহালার মতো বাক্সটার ডালা খুলে ফেলেছেন। আর বার করে এনেছেন এক আড়াই, তিন ফুট মাপের এক পৌরাণিক স্টাইলের তরবারি। যেমন ধারার জিনিস কুরোসাওয়ার ছবিতে সামুরাইদের হাতে দেখেছি। পুরনো জাপানি পেণ্টিঙে দেখা যায়। জাপানি হিরো তোশিরো মিফুনে যা নিয়ে শপাং শপাং চালান। যেমন একটা তরোয়ালে আমার প্রিয় জাপানি লেখক ইউকিও মিশিমার মাথা কেটেছিল তাঁর শিষ্য, গুরুদেব নিজের হাতে ভোজালি চালিয়ে পেট ফাঁসিয়ে হারাকিরি করার পর।
আমি উত্তেজনায় ঘরের অন্য চেয়ারটায় ধপাস্ করে বসে পড়লাম। প্রৌঢ় দেখি পেতল আর পশমের খাপ থেকে সড়সড় করে বার করে আনছেন তরোয়ালটা। আমার গা হঠাৎ শিরশির করে উঠল। মুখ ফুটে বলতে পারলাম না, আহা, করেন কী ? করেন কী ?
ততক্ষণ খাপখোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে শিক্ ! শিক্ ! আওয়াজ

তুলে সেটা চালিয়ে নিলেন প্রৌঢ়, যেন মলিন আধুনিক স্যুটবুটে এক মধ্যযুগীয় সামুরাই। আমি বুঝে উঠতে পারলাম না ভদ্রলোক একটা তরোয়াল বেচতে এসে এরকম নেত্য করতে শুরু করলেন কেন। ওভাবে খানিকক্ষণ চললে তো আমায় পুলিস ডাকতে হবে।

প্রৌঢ় কসরৎ থামিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, পুরনো সামুরাই সোর্ড। দেবী জুনতেই কান্ননের মন্দিরের অস্ত্র।

আমি অবাক হয়ে গেছি। লোকটা স্রেফ ক্ষ্যাপাই নয়। শয়তানও। মন্দিরের অস্ত্র বেমালুম বিদেশিকে ঝেড়ে দিচ্ছে! আর জাতির সম্পদ এই জিনিস কিনে আমিও কি জেলে যাব নাকি?

প্রৌঢ় এবার তরোয়ালটা নিয়ে খাটের পাশে শোয়ানো আমার স্যুটকেসটার ওপর ফেলে মাপতে লাগলেন। মালটা বাক্সে ধরে যাবে দেখে বেশ প্রফুল্ল হয়েছেন বোঝা গেল। তাই সোর্ডটা নিয়ে ফিরে এলেন আমার সামনে আর বললেন, ইণ্ডিয়ান?

হা ভগবান! লোকটা তাহলে আমার জাতপাত জেনেই আছে! অগত্যা মাথা নেড়ে বোঝালাম, হ্যাঁ।

প্রৌঢ় বললেন, আপনাদের দুর্গা আর আমাদের জুনতেই কান্নন এক। এঁদের চেহারা ও চরিত্র এক। এঁদের দুজনের হাতেই এই অস্ত্র।

এতক্ষণ যে আমি নানাভাবে কৌতুক বোধ করছিলাম সেই আমি এবার বেবাক স্তব্ধ! ভদ্রলোক শুধু আমাকে ভারতীয় হিসেবে শনাক্তই করেননি, তিনি দেবী দুর্গা সম্পর্কে আগাম তত্ত্ব আদায় করে বসে আছেন। আর সেই, জাপানি দুর্গার তরবারি একটা এনে আনবি তো আন আমার কাছেই!

আমি প্রায় আর্তনাদ করে বললাম, কিন্তু এই মহামূল্য বস্তু কেনার টাকা আমার নেই।

ভদ্রলোক খাপের পাশে তরোয়ালটা রাখতে রাখতে বললেন, দুর্গার অস্ত্র দুর্গার দেশে যাবে। ওনলি থাউজেণ্ড ডলারস!

থাউজেণ্ড ডলারস! মাই ফুট! আমি মনে মনে বললাম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বেশ ভালই আশ্বস্ত হয়েছি প্রৌঢ় থার্টি থাউজেণ্ড

বলেননি বলে। যে-দেশে এক কাপ চায়ের দাম পঁচাত্তর টাকা সেখানে একটা প্রাচীন সামুরাই তরবারির দাম তো মার্সিডিস বেঞ্জ গাড়ির দামের মতো হওয়া বিচিত্র নয়।

কিন্তু ওই হাজার ডলারটাই আমার কাছে মার্সিডিসের দামের মতো। পেটে কিল মেরে মেরে দেড় সপ্তাহে বাঁচিয়েছি শ'পাঁচেক ডলারের মতো। অর্থাৎ হোটেল-ফোটেলের বিল মেটাবার পর ওইরকম একটা অঙ্ক পড়ে থাকবে পকেটে। তা' থেকে আগামীকাল এয়ারপোর্ট যাবার খরচ। জানি না এয়ারপোর্ট ট্যাক্স-ফ্যাক্সও টোকিওয় লাগে কিনা। এছাড়া বাচ্চার জন্য একটা ছোট্ট জাপানি ডল, বৌয়ের জন্য একটা জাপানি শিফন শাড়ি। তারপর ডিউটি ফ্রি থেকে একটা হুইস্কি, এক কার্টনসিগারেট গিন্নির একটা পার্ফিউম (এটা না নিলে নিজের পিছনে লাথি মারতে ইচ্ছে করবে) আর তার পরেও কিছু কড়া-গণ্ডা পড়ে থাকলে নিজের জন্য একটা সস্তার আফটারশেভ।

আমি গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বললাম, ঠিক আছে। আপনার জিনিস দেখা হল, এবার আপনি আসুন।

প্রৌঢ় সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটা অ্যাশট্রেতে টিপে দিতে দিতে বললেন, মাত্র একহাজার ডলার। বিনিময়ে সামুরাইদের হাতে লড়াইয়ে ব্যবহৃত জুনতেই কান্ননের মন্দিরের বোদাই কিরিদাশি।

বোদাই কিরিদাশি! সে আবার কী? কী বকছে লোকটা আগড়াম বাগড়াম?

প্রৌঢ় আমার ধন্ধ আঁচ করতে পারলেন। বললেন বোদাই কিরিদাশি মানে মস্ত ছুঁচলো ছোরা।

আমার তাতে ধন্ধ কিস্সু কাটল না। বললাম, এই অ্যাত্ত বড় তরোয়ালটাকে বলছেন ছোরা?

প্রৌঢ় ফের মিটিমিটি হাসি ধরলেন।—আরে ভাই, সেই দেবদেবীর যুগে যা সব তরোয়াল ব্যবহার হতো সে তুলনায় এ তো নিতান্তই ছোরা।

আমি বুঝ মানার ভাব করে বললাম, তাই বুঝি?

প্রৌঢ় তড়াক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে বললেন, ভাবুন তো

জাপানের সেই মধ্যযুগ! সেই সামুরাই জীবন ও ব্রত। ওদের মতো যোদ্ধাসমাজ পৃথিবীর কোথাও কখনও হয়নি। আর হবেও না। কেউ ভাবতেও পারে জাপানের এখন একটা নিজস্ব সৈন্য-বাহিনী, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা নেই! নিজেদের সুরক্ষার জন্য আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয় বিদেশিদের দিকে। আমরা কি এই সামুরাই তরবারি আগলে রাখার যোগ্য লোক? যান নিয়ে যান পাঁচশ ডলারে। ওই শেষ দাম।

আমি বেশ বিচলিতই হয়েছিলাম প্রৌঢ়র কথায়, কিন্তু তরোয়ালটা না-কেনার সিদ্ধান্তে অবিচল রইলাম। অবাস্তব একটা দাম হেঁকে লোকটাকে বিদেয় করার বন্দোবস্ত করলাম—হানড্রেড ডলারস!

আমি তরোয়ালটা দিয়ে কোপ বসালেও হয়তো এরকমই প্রতিক্রিয়া হতো ভদ্রলোকের। প্রথমে চমকে ওপরে মুখ তুলে চাইলেন, তারপর একটু একটু করে কুঁচকোতে লাগল ওঁর মোটামুটি মসৃণ মুখ। চোখ-দুটো চিকচিক করল কি? হাসিটা একেবারে মিলিয়ে গেল। ভাঙা-ভাঙা স্বরে বললেন, একশ ডলারে জুনতেই কান্ননের মন্দিরের সোর্ড!

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তরোয়ালটা ভরতে লাগলেন খাপে। আমি বিব্রত কণ্ঠে বললাম, মহাশয়, আপনাকে আমি অপমান করতে চাইনি। কিন্তু দু'শ ডলারের এক সেণ্ট বেশি খরচ করার উপায় আমার নেই। আমার সব টাকা ফুরিয়ে এসেছে, আমি কালই চলে যাব। দু'শর বেশি এক ডলারও···

কথা বলতে বলতে কখন যে আমি পঞ্চাশ ডলারের চারটে নোট বের করে ফেলেছি খেয়াল নেই, ভদ্রলোক হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন, টাকা থাক। মুখে বললেন, তরোয়াল রইল। রাতে নিশ্চিন্ত মনে ওকে দেখুন। তারপর ঠিক করুন কত দাম অব্দি যাবেন। আমি কাল সকাল আটটায় আসব। দরজার দিকে এক কদম ফেলে কী মনে করে পিছন ঘুরে আমার হাতে-ধরা নোটগুলো নিয়ে বললেন, আচ্ছা, টাকাটা আমি রাখছি। এর বেশি আর কতদূর যাবেন ভেবে রাখবেন। আমি ঠিক ব্যবসা করছি না। দেবীর খাঁড়া, ডোণ্ট ফরগেট!

বলে জাপানি-প্রথায় নিচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি দরজা এঁটে দিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় সামুরাইয়ের তরবারি দেখতে বসলাম।
তরবারিটা তখনও খোলা পড়ে আছে তার খাপের পাশে। কালো পশম আর পেতলের খাপে কতকগুলো দুর্বোধ্য চিহ্ন আঁকা। জাপানিতে একটা-দুটো কথা লেখাও, যা আমার কাছে হিব্রু বা গ্রিকের চেয়ে বেশি সুবোধ্য নয়। তরোয়ালের হাতলের ওপর অবিশ্যি একটা বীভৎস মুখোশ ছাপ। কে জানে এই মুখই দেবী জুনতেঁই কান্ননের কিনা।
আমি আস্তে করে তরোয়ালটা তুলে ডেস্কের ধারটায় এনে রাখলাম। রেখে ফলার ধারের দিকটায় আঙুল ছোঁয়ালাম—ইস্! ধার বলে ধার! একটু ঘষলেই হয়তো আঙুলটা পড়ে যাবে কাটা মুলোর মতো। শুধু আঙুল নয়, আমি নিজেকেও সরিয়ে আনলাম তরোয়ালের পাশ থেকে। কে জানে এসব দেবদেবীর খাঁড়ার নিজস্ব প্রাণ আছে কিনা! আমার মনে পড়ল লেখক মিশিমার কথা। ওঁর সাহেব জীবনীকারকে নিয়ে একবার ওঁর সংগ্রহের সমস্ত তরোয়াল দেখিয়েছিলেন। খাপ কেটে বেরিয়ে যাবার মতো ধার সবেতে। কার্পেটের ওপর উবু হয়ে বসে সেইসব তরোয়াল দেখতে দেখতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল সাহেবের।
আমি ডেস্কে রাখা আমার উড পেনসিলটা তুলে নিয়ে তরোয়ালের ফলায় আলতো করে ঘষলাম। অমনি কুচুক করে কেটে পড়ে গেল পেনসিলের এক ভাগ। এবার আমি হাতে-ধরা অংশটাকে ঘষলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেটা দু'খণ্ড হয়ে গেল। তখন বাকি অংশটা। হঠাৎ চমকে উঠে আবিষ্কার করলাম যে আমি বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে ধরা এক চিলতে কাঠটুকু ঘষতে যাচ্ছি। তাতে কাঠ নয় আঙুলও…!
আমি তৎক্ষণাৎ অবশিষ্ট পেনসিলটুকুকে ছুঁড়ে দিলাম ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। নিজের ঘরে নিজের বোকামিতে কোনও রক্তপাত ঘটানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। আমি তরোয়ালটাকে খাপে ভরতে উদ্যোগী হলাম। কিন্তু কাছে যেতেই চক্‌চকে ফলায় টেবিল

ল্যাম্পের আলোয় এক তীব্র বিচ্ছুরণ দেখলাম। চোখে রোদ পড়ে ধাঁধিয়ে যাওয়ার অবস্থা তখন আমার। আমি ফলার থেকে চোখ সরিয়ে আঙুল দিয়ে চোখ কচলালাম। আর দু'পা পিছিয়ে এসে বসে পড়লাম আমার ছোট্ট সাত বাই তিন খাটে। বলা যায় সামুরাইয়ের তরবারির থেকে কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে।

আর আমার মনে পড়ল আলব্যের কামুর 'দ্য আউটসাইডার' উপন্যাসে অচেনা আরবটির বার করা ছোরায় প্রতিফলিত সূর্য-রশ্মিতে নায়ক ম্যরসোর চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার ঘটনা। যখন প্রায় অবধারিত প্রতিক্রিয়ায় আঙুল চেপে বসল রিভলভারের ট্রিগারে, ছুটে গেল গুলি। আমার মনে পড়ল বোর্হেসের গল্প 'দ্য ডুয়েল' যেখানে কথক বলছেন যে বহুদিন ঘুমিয়ে থাকা ছোরাগুলিই দ্বন্দ্বে লড়ছে, ছুরির মালিকরা নিমিত্ত মাত্র। আমার মনে পড়ল মিশিমার অন্তিম লগ্ন। যে-হারাকিরি তিনি একদিন নিজে অনুপুঙ্খ ডিটেলে বর্ণনা করেছিলেন তাঁর এক বিখ্যাত রচনায় সেই হারাকিরিই তিনি করলেন জাপানের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ভবনের তিনতলায়। তার আগে তাঁর নিজের গড়া যুববাহিনীর সদস্যদের নিয়ে কব্জা করে নিয়েছেন প্রতিরক্ষা ভবন। কিন্তু দেখতে দেখতে সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে মস্ত প্রাসাদটি। কেউ চায় না গুলি চালিয়ে দেশের সেরা লেখককে হত্যা করতে; বাহিনীর দাবি মিশিমা আত্মসমর্পণ করুন। অথচ ওই একটি শব্দ লেখা নেই আধুনিক সামুরাইটির অভিধানে। তিনি ঘরের দোর এঁটে বসলেন হারা-কিরি-যজ্ঞে। শিষ্যকে তৈরি রাখলেন উদ্যত তরবারি নিয়ে পিছনে। ভোজালি দিয়ে নিজের নাড়িভুঁড়ি বাইরে ঢেলে ফেলা হলে শিষ্য সোর্ড চালিয়ে উড়িয়ে দেবে মাথাটা।

আমার খিদে চলে গেল, ঘুমের বদলে একটা স্বপ্নের ঘোর এসে জেঁকে বসল চোখে। আমার খেয়াল হল যে টোকিওর এই শিনজুকু পল্লীতেই সেই প্রতিরক্ষা ভবন। আমার দোভাষী মাসুদা দেখিয়েওছেন বাড়িটা আমাকে। আমার ঘরের জানালা খুললে সে বাড়ির মাথায় টাঙানো র‍্যাডার-টাওয়ারটা দেখা যাবে। কিন্তু মাইনাস দু ডিগ্রি টেম্পারেচারে জানালা খুলে ওই দৃশ্য দেখে কার

সাধ্যি !

ভাবনাটা এসেই মিলিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তারই মধ্যেই আমি জানালা খুলে গরম ঘরটাকে কবরের মতো ঠাণ্ডা করে ফেলেছি। হঠাৎ ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপা শুরু হয়েছে আমার। কিন্তু আমি অবোধ আহ্লাদে চেয়ে আছি মিশিমার মৃত্যুক্ষেত্রের ওপর দাঁড়ানো র‍্যাডার-টাওয়ারটার দিকে। একটা ভৌতিক দমকা হাওয়া এসে জানালাটা হঠাৎ বন্ধ করে না দিলে ওই জানালা কোনদিন বন্ধ হতো বলে মনে হয় না। সকালে চেম্বার মেড এসে একটা ঠাণ্ডা মৃতদেহ খুঁজে পেত চুয়াল্লিশ নম্বর ঘরে।

চেম্বার মেড আমাকে উষ্ণ, জীবিতই খুঁজে পেয়েছিল। তবে শোয়া নয়, বসা। সারাটা রাত আমি কাটিয়ে দিয়েছি টেবিল ল্যাম্পের আলোয় তরোয়ালটা দেখতে দেখতে। দরজায় মেডের টোকায় আমার চটকা কাটল, ঘড়িতে দেখি ছটা। গতকালই বলে রেখেছিলাম (বোঝানোর সেই কসরৎ আর নতুন করে ভাবতেও চাই না) সাড়ে দশটায় প্লেন ধরার আছে নারিতা এয়ারপোর্টে। কাজেই ছ'টায় তুলে দেওয়া চাই। আমি 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলতে দরজা খুলে দেখি মেয়েটি একটা কাগজের কাপে কফিও এনেছে আমার জন্য সেলফ সার্ভিস মেশিন থেকে। আমি কফিটা নিয়ে টেবিলে রেখে খুচরা পয়সাটা দিতে গেলাম কিন্তু 'নো' ! 'নো' ! বলতে বলতে মেয়েটি মিলিয়ে গেল প্যাসেজে। গরীব ভারতীয়টার জন্য এই ভালবাসাটুকু ওর ভেতর জমেছে। উষ্ণ কফিতে চুমুক দিতে রাতের উত্তেজনাগুলো মিলিয়ে যেতে থাকল। আমি কফি শেষ করে রওনা হওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করলাম। বলতে গেলে তরোয়ালের কথা আমি ভুলেই গেলাম।

আমি তৈরি। থ্রি পিস স্যুট, টাই পরে আফটার শেভ হাতের চেটোয় ঢেলে গালে মাখছি, শুনি টক্‌ টক্‌ টক্‌। এই নক চেম্বার মেডের নয়। ঘড়িতে দেখছি মোটে সাতটা। তাহলে টাকার টানে প্রৌঢ় কি একঘণ্টা আগেই হানা দিল। যাকগে ভালই হল, কিনি বা না-কিনি (দাম বাড়ালে নো কেনাকাটা!) একটু আগেই বেরুনো যাবে। আমি আফটার শেভের বোতলটা হ্যাণ্ড-

ব্যাগে ঢুকিয়ে কোনও আওয়াজ-টাওয়াজ না দিয়েই দরজাটা খুলে দিলাম। আর অমনি একটা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে এলেন কালকের সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক নন, এক মধ্যবয়স পার-করা ভদ্রমহিলা। তাঁর হাতে কতকগুলো ডলারের নোট আর মুখে আর্তনাদ 'সর্বনাশ হয়ে গেছে! সর্বনাশ হয়ে গেছে! আমি আর বাঁচব না! বুড়োটা আমায় মেরেই ফেলবে!'

কী সর্বনাশ হল, কার সর্বনাশ হল, কে ঘটালো, আর তার সঙ্গে আমারই বা কী যোগ এর কোন কিছুই মাথায় খেলার আগে ভদ্রমহিলা এসে সামুরাইয়ের তরোয়ালটা তুলে বুকের মধ্যে জাপ্টে ধরলেন। ওই ধারালো অস্ত্র ওভাবে ছেলে কোলে-করার মতন করে ধরলেনই বা কী করে? খাপে পুরে নিয়েও তো বগলদাবা করা যেত। ইনি কি মেয়ে সামুরাই নাকি? নাকি দেবী জুনতেই কান্ননের বিংশ শতকীয় অবতার?

আমি নিজে কিছু বলার আগে ভদ্রমহিলা এক হাতে তরোয়াল ধরে অন্য হাতে ডলারগুলো বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। দেখলাম কাল প্রৌঢ়কে দেওয়া সেই দু'শ ডলার। মহিলা কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, মাফ করবেন মহাশয়, এই সোর্ড আপনি কিনবেন না। আমার পাজি বুড়ো বর দু'বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে এটা বেচে দিতে। যেভাবে বংশের সমস্ত মূল্যবান জিনিসই ও খুইয়েছে। আমরা জাপানি মেয়েরা বড্ড অসহায়, আমাদের পুরুষরা কোনও কথাই আমাদের শোনে না। আমি শুনেছি আপনি ভারতীয়, আপনি আমার কথাটা রাখুন।

আমি বিহ্বল হয়ে ভদ্রমহিলাকে দেখতে থাকলাম। কিছুদিন আগেও নিশ্চয়ই খুবই সুন্দরী ছিলেন। পুরনো পোশাকে তো কাবুকি নায়িকাই মনে হতে পারত। বুড়োর অত্যাচার কিংবা অভাবের ধাক্কাতেই হয়তো সব যাচ্ছে। স্পষ্ট ইংরেজি থেকে বোঝা যায় মহিলা শিক্ষিতও। এবং এখন, এই মুহূর্তে, খুবই দুঃখিতও। আমি হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে বললাম, আমি না নিলেও তো অন্য কাউকে তরোয়ালটা বেচে দেবেন আপনার কর্তা। একবার যখন রোখ চেপেছে···

ফস্ করে মহিলা বললেন, আমি দেব না।
কিন্তু কেন?
কারণ আমি চাই না এই অভিশপ্ত তরোয়ালের অমঙ্গল অন্য কারও সংসারে বর্তাক!
আমি আতঙ্ক ও কৌতূহলে জব্দ হয়ে বললাম, অভিশপ্ত? কার অভিশাপ? দেবী জুনতেই কান্ননের?
মহিলা ঠোঁট আর নাক ফুলিয়ে বললেন, ও! ওই সব বুজরুকি আপনাকেও শুনিয়েছে?
বললাম, কেন, সে সব কি মিথ্যে?
মিথ্যে ছাড়া আবার কী! এই তরোয়াল অভিশপ্ত, যুদ্ধের পর ওর বাবা আর কাকা হারাকিরি করলে এ দিয়ে ওঁদের মাথা কাটানো হয় জানলে কে ছোঁবে এই অস্ত্র? ও তো বেচতেই চায় জিনিসটা, তাই একে পবিত্র করে তোলে দেবী জুনতেই কান্নন এবং আরও কত সব দেবদেবীর নাম করে। যেটা যখন কাজে দেয়। কিন্তু এই পাপ আমি আর কারও ঘরে ছড়াতে দেব না!
মহিলা এবার তরোয়ালটা কোল থেকে নামিয়ে খাপে পুরতে লাগলেন। তাঁর চোখে দু'ফোঁটা অশ্রু ভেসে উঠল। অথচ এ কী ভীষণ বিবর্তন আমার মধ্যে! দেবদেবী সামুরাইয়ের কথা বলেও যে জিনিসটাকে প্রৌঢ় অত আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেননি কাল, আজ হঠাৎ যুদ্ধপরাস্ত দুই সৈনিকের হারাকিরির সংস্রবে কী ভীষণ মূল্যবান হয়ে উঠেছে আমার কাছে। এও ঠিক যে এর ফলে জিনিসটা আর প্রাচীন কোনও প্রত্নদ্রব্য রইল না, কিন্তু চুলোয় যাক প্রাচীনতা। দুই বীরের শিরশ্ছেদ ঘটিয়েছে যে তরবারি সে তো দেশ কালের ঊর্ধ্বে। এ তো সাক্ষাৎ জীবন। জাদুবাস্তব। যা আমার চাই-ই চাই।
আমি এগিয়ে গিয়ে মহিলার কাঁধে হাত রাখলাম। বললাম, আপনার স্বামী যখন তাঁর পিতার ও পিতৃব্যের রক্তমাখা এই তরোয়ালের মূল্য দেয় না তখন একে আপনি আর আঁকড়ে রাখতে চাইবেন না। এরপর কোনদিন ঝোঁকের মাথায় উনি লোহালক্কড়ের দোকানেই বেচে দেবেন। আপনি আমায় এই বীরত্বের স্মারকটি নিয়ে যেতে দিন।

আমি সম্মানের সঙ্গে একে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখব। আমার পরিচিত সবাইকে বলব আপনার শ্বশুর ও খুড়শ্বশুরের কথা। আর যদি অভিশাপের কথা বলেন তো বলি আমি ওইসবে এত্তোটুকু বিশ্বাস করি না।

মহিলা অস্ফুট স্বরে বললেন, কিন্তু ওই তরোয়াল যে রক্তপানে অভ্যস্ত…

আমি বললাম, ভয় নেই, তরোয়ালে মৃত্যু হয় বীরদের। আমি বীর নই। খুনীও নই। আমি শুধু স্মারক করে একে রাখব।

মহিলা দ্বিধা দ্বন্দ্ব লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে রইলেন। আমি গতকালকের দু'শ ডলারের সঙ্গে আরও দেড়শটা ডলার জুড়ে ওঁর হাতে ধরে দিলাম। বললাম, এ জিনিসের কোনও দাম হয় না। আমি দাম দিচ্ছি না। এ আমার কৃতজ্ঞতার স্মারক।

চেক-ইন করে নারিতা এয়ারপোর্টে বসে আছি সিকিউরিটি কলের অপেক্ষায়। প্লেন নাকি ঘণ্টাখানেক লেট। একটা সিগারেট ধরিয়ে জল্পনা করছি কী কী নেওয়া যায় ডিউটি ফ্রি শপ থেকে। অতগুলো ডলার উড়িয়ে একেকটা রোমহর্ষক বস্তু কিনেছি বটে, কিন্তু এ জিনিসের মূল্য বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন বুঝলে হয়। হারাকিরি, সুমো কুস্তি কি গেইশা নাচ নিয়ে কে আর মাথা ঘামায় দেশে ? সবাই বোঝে জাপানি সিল্ক, শিফন, বোন চায়না, ক্যামেরা, ঘড়ি, টিভি। 'তরোয়ালের খাতিরে গিন্নির শিফন কেনা হল না, বাচ্চা মেয়েটার পুতুলও বাদ পড়ল। ডিউটি ফ্রি-তে একটা ছোট্ট ডলও কি পাওয়া যাবে না। বাকি টাকায় গিন্নির একটা পারফিউম। আর তারপর জাস্ট একটা হুইস্কি আর এক কার্টন সিগারেট। দোহাই ভগবান, এইটুকু বরাদ্দ কর……

কিন্তু, কিন্তু আমি কী শুনলাম আমার পাশের ওই মার্কিন দম্পতির কথাবার্তায় ? একটু আগেই সামান্য আলাপ। জাপান সফর শেষে ব্যাঙ্কক যাচ্ছে। আমার সঙ্গে এয়ার-ইণ্ডিয়ার প্লেনে। বৌটি জানতে চাইল আমার টোকিও কেমন লেগেছে। বলেছি, দারুণ। তবে বড্ড এক্সপেনসিভ। বড়লোকের দেশ আমেরিকার এই ধনী দম্পতিও

কিন্তু সায় দিল তাতে। কিন্তু এখন ওদের নিজেদের মধ্যে আলোচনাটা আরও মনকাড়া হচ্ছে আমার কাছে। কারণ ওরা কথা বলছে হারাকিরি নিয়ে। বস্তুত হারাকিরির পদ্ধতি ও অস্ত্র নিয়ে।

স্ত্রী জিজ্ঞেস করছে, কিন্তু এই তরোয়ালটা দিয়ে কী হয়? স্বামী বলছে, যে হারাকিরি করছে সে পেট কেটে ফেলে ব্যথায় গোঙাতে থাকলে পাশে দাঁড়ানো বন্ধু বা সহচর এই সোর্ড দিয়ে তার মাথা উড়িয়ে দিয়ে বেদনা রদ করে। এভাবে মাথা কেটে দেওয়াটা পরম মিত্রতার কাজ। খুব পুণ্য কাজও।

স্ত্রী জানতে চাইল, কিন্তু ব্যাঙ্ককের কাস্টমসে পাস করবে এই ধরনের জিনিস?

স্বামী বলল, বোঝাতে হবে যে এ পৌরাণিক সম্পদ নয়। এর মূল্য যে এতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুজন বীর সৈন্য আত্মবলিদান করেছে। সেন্টিমেন্টাল সুভেনির।

আমার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। লোকটা বলে কী। ওর তরোয়ালের গল্প আর আমার তরোয়ালের গল্প তাহলে এক! মানে দুজনেই আমরা···

আমি হাতের সিগারেটটা পাশের অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে দাঁড়ালাম গিয়ে ওদের সামনে। আমার বাঁ হাতটা অনাবশ্যক কাঁপছে। বললাম, তোমরা কি এক প্রৌঢ়ের কাছ থেকে একটা সোর্ড কিনেছ?

স্বামীটি বলল, হ্যাঁ।

বললাম, দেবী জুনতেই কান্ননের মন্দিরের তরোয়াল?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো বলেছিল! কিন্তু···

কিন্তু পরে তার স্ত্রী এসে বলল ওসব বুজরুকি। আসলে ওটা লোকটির হারাকিরি করা বাবা-কাকার মাথা-কাটা তরোয়াল?

ঠিক! অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট! কিন্তু তুমি এসব কী করে জানলে?

আমি জীবনের দীর্ঘতম নিঃশ্বাসটা ছেড়ে বললাম, কারণ আমিও·

ওই একই জিনিস কিনেছি !
এবার ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে স্ত্রীটি। সে-ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তার মানে তুমি বলতে চাও ওরা ঠগ? জোচ্চর? পঞ্চাশ ডলারের জিনিসটাকে…
ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি বললাম, এগজ্যাক্টলি !
মেয়েটি এবার 'ও মাই গড !' বলে ধপাস করে বসে পড়ল সিটে। আর বলতে লাগল, আর এই বস্তুটির জন্য আমি আমার সমস্ত কেনাকাটা বাতিল করলাম ?
আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, কেন, কত দাম দিয়েছ তোমার তরোয়ালের ?
এবার স্বামীটিই আর্তনাদের ধ্বনিতে বলল, দশ হাজার ডলার ! দ্য প্রাইস অফ এ নিউ জ্যাপানিজ কার অর এ সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মার্সিডিস বেঞ্জ !
জানি না হঠাৎ কেন ভেতরটা বেশ হাল্কা হয়ে এল। সাড়ে তিনশ ডলারে কী কী হতে পারে ভাবার আর সংকীর্ণতা রইল না। ভীষণ রাগ আর দুঃখে হাসি পেয়ে গেল। হা হা করে হাসতে হাসতে কবুল করলাম, আমায় তাহলে বেশ সস্তায় ছেড়ে দিয়েছে। সাড়ে তিনশ ডলার।
এবার হাসতে লাগল স্বামীটি। স্ত্রীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, তাহলে ব্যাংককে নেমে কাস্টমসে লাগেজ খুললে রদ্দি মালটা নিয়ে কী করা ?
স্ত্রীর রাগ আর দুঃখ আরও জেঁকে বসেছে। সেই রাগী, ভারী মুখেই বলল, কী আর করা ? এয়ারপোর্টের মেঝেয় বসে হারাকিরি ছাড়া !
বলেই নিজের কথায় নিজেই হেসে ফেলল।
মাইকে ঘোষণা হল এয়ার-ইণ্ডিয়ার প্যাসেঞ্জারদের সিকিউরিটি চেকে যাওয়ার জন্য।

তিনজন হাবিলদার ধরাধরি করে দেহটা এনে শুইয়ে দিল বসার ঘরের মধ্যিখানে রোঁয়া ওঠা কার্পেটের ওপর। একটা প্রমাণ সাইজের ড্রইং রুমের পক্ষে একটা প্রমাণ সাইজের পুরুষের দেহ খুব বেঢপ বস্তু নয়। কিন্তু একটা মৃতদেহ খুব বড় জিনিস, সব ঘরকেই এক মুহূর্তে ছোট করে ফেলে। একটা মৃতের চার পাশে বেশ কিছু জীবিত লোকের জায়গা রাখতে হয়। অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে কিছু সেপাই-পুলিশেরও দাঁড়াবার জায়গা করতে হয়। আর তারা যেহেতু জুতো খোলেনা তাই কার্পেট-টার্পেটের দিকে বিশেষ ঘেঁষে না। যেমন এখন।

গৌরাঙ্গকে শুইয়ে দিয়ে হাবিলদার তিনজন সরে আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অফিসার দু'জন দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। একটু পরেই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়বে পাড়া-প্রতিবেশীরা। পুলিশরা ভীরু চোখে অপেক্ষায় আছে, সবিতা বিকট আর্তনাদ করে আছড়ে পড়বে গিয়ে স্বামীর ওপর।

কিন্তু সবিতা স্থির হয়ে বসে আছে ডিভানের ওপর। বাকি জীবন যাকে গুমরে মরতে হবে তার কান্না অভ্যেস না করাই ভাল। গৌরাঙ্গ শুধু মরেইনি, একটা ঘটনা ঘটিয়ে গেল। ও আপিস যাবার নাম করে স্বর্গে চলে গেল। ও বলেওনি সবিতাকে যে, ওর মনে মৃত্যু আছে। পকেটে করে ঘুমের ওষুধ নিয়ে যে আপিস যায়, সে মলয় চন্দন সাবান মেখে চান করে কেন তাহলে? পেস্ট ফুরিয়েছে দেখে সকালে পেস্ট কিনতে বেরোয় কেন? পুজোর নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি চড়াচ্ছে কেন? কেন খেতে খেতে প্রশংসা করে মুড়িঘণ্টার ডালের? মৃত্যু যদি এতই স্বাভাবিক হবে, তাহলে সকালে খবরের কাগজে পাঞ্জাবের নরহত্যার স্টোরি পড়ে হাত-পা ছুঁড়ে বলেছিল, "ওঃফ্! এই কাগজগুলো একটা যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়াচ্ছে?" আর কেনই বা

নিজের বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমের ভান করে শেষ নিদ্রায় ঢুকে পড়তে পারল না ?
মৃত্যুর খবর নাকি আগুনের মতো ছড়ায়। বাজে কথা। মৃত্যুসংবাদ বাতাসে ভর করে থাকে শীতের সন্ধের ধোঁয়াশার মতো। না হলে এত পাল পাল লোক হঠাৎ করে ফ্ল্যাটের দরজায় এসে জড়ো হয় কী করে ? অচেনা মৃতের পাশে কাঁদতে বসে যারা তারা আসলে আপন-জনদের কান্না দেখতে ভালবাসে। কিন্তু ওই কান্নাটা সবিতা কাঁদবে না কিছুতেই। একটা ভালবাসার লোকের জন্য যত কান্নাই থাক না বুকে তা বাকি জীবন ধরে কাঁদলে অনেক অনেক ফুসরৎ হবে। না, গৌরাঙ্গর এভাবে চলে যাওয়াটা কান্নার বিষয়ও নয়। ও বেঁচে থাকলে গালে চড় কষা যেত। পাঞ্জাবি টেনে ফালা ফালা করা যেত। বাহারী চশমাটা দেওয়ালে ছুঁড়ে ভাঙা যেত। আপিসের চেয়ারে বসে ঘুমের বড়ি খেয়ে ও এত নাটক ফেঁদেছে যে সবিতা এখন যা-ই করবে তা দৃষ্টিকটু হবে ওর নিজের কাছে। অথচ দেহটাকে অন্য কারও মড়া ভেবে মুখ ঘুরিয়েও বসে থাকা যাচ্ছে না। সবিতা আঁচলের খুট দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

ঘরে এখন থিক থিক করছে লোক। সবাই কাঁদতে প্রস্তুত, শুধু সবিতার অপেক্ষায়। এক মহিলা ধরা-ধরা গলায় বললেন পাশের বৌটিকে, মুখের চাদরটা সরানো যায় না। বৌটি চোখ তুলে ইশারা করল পুলিশের দিকে। ময়না তদন্তে ছেঁড়াকাটা দেহের আবরণ খোলা পুলিশই পারে। পাশে দাঁড়ানো হাবিলদারগুলোও উবু হবে না অফিসারের নির্দেশ না পেলে। একজন অফিসার একটু আগেই ফিসফিস করে বলছিল অন্য অফিসারকে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে এখন কোনও কথা নয়। ওঁকে শান্ত হতে দিন। সবিতা কান্না শুরু করলেই ওরা ঘর ছেড়ে যাবে, এমন একটা ভান। কিন্তু সবিতা কাঁদবে না।
গৌরাঙ্গর বৃদ্ধ জ্যাঠামশাই ধীর পায়ে এসে একটা সোফার ওপর বসলেন। গত দু দিন ধরে গৌরাঙ্গর মা, জেঠি আর স্ত্রীকে বোঝাচ্ছিলেন, তোমরা উতলা হয়ো না। এটা নিয়তি। পূর্বজন্মের

ফল। তা না হলে এরকম রাইজিং স্টার যার, সে অমন কাণ্ড করে! দু মাস আগেও স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে এসে গৌরাঙ্গর সঙ্গে জ্যোতিষ্কের সত্যিমিথ্যে নিয়ে তর্ক করে গেছেন। ইংরেজি সাহিত্যের রিটায়ার্ড অধ্যাপক সেদিন ডাইনিং টেবিলে বসে কাঁপা কাঁপা গলায় বলছিলেন, দ্য বেস্ট স্টার টু বিলিভ ইন ইজ ইউ ইয়োরসেলফ। তুমিই তোমার নক্ষত্র আর তোমার পরিবেশ তোমার রাহু। সেই জ্যাঠামশাই এখন ভাইপোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে আছেন। জ্যোতির্বিদ যেন নিরীক্ষণ করছেন একটা নিভে যাওয়া তারাকে।

গতকালই ঋতুচক্রের চতুর্থ দিন কেটেছে। গৌরাঙ্গ জানলে খুব খুশি হতো। কত কত দিন সবিতাকে আবেগে জড়িয়ে ধরার পর ওকে শুনতে হয়েছে, না গো মশাই, আমার শরীর খারাপ। তখনও হতাশায় চিৎ হয়ে পড়ত যেন শরশয্যায় ভীষ্ম। কিন্তু "আজ নিরাপদ" এমন কিছু বলেও ওকে জাগানো যাবে না। টেলিফোনে ওই খবর পাবার পর থেকে ও যে তেড়েফুঁড়ে সাদা শাড়ি ধরেছে এও জানার সুযোগ নেই গৌরাঙ্গর। প্রাণ না থাকলে মানুষ যে কী ভীষণ বদলে যায় এত বেশি করে সবিতা কখনও জানতে পারেনি। কোনও দায়দায়িত্ব নেই, মান, অভিমান, দয়া নেই, তর্ক করার বাসনা নেই, সন্দেহ নেই, লোভ নেই, পিপাসা নেই, ক্ষুধা নেই, আদর পাবার বা দেবার চক্রান্ত নেই, নিজের কোনও একটি স্বভাব কি দোষের পুনরাবৃত্তি নেই, কী রকম মূকবধির জড় হয়ে শুয়ে থাকা। গৌরাঙ্গর গলাটিপে ধরার ইচ্ছে হল সবিতার। শেমলেস বাস্টার্ড।

ঠিক যেভাবে প্রায় জামার কলার আঁকড়ে একদিন চেঁচিয়ে উঠেছিল সবিতা বছর দুই আগে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা হচ্ছিল তখন। গৌরাঙ্গ কিন্তু খুব শান্তভাবে সামলে নিচ্ছিল পরিস্থিতি। শুধু বলছিল, কেন, কী হল এমন যে বাড়ি মাথায় করছ?

কী! কী হল এমন? কেন, সত্যি করে বলো তো তুমি মিসেস

রাউতকে দেড় লাখ টাকা লোন স্যাংশন করোনি? বল!
গৌরাঙ্গ ফের শান্তভাবেই বলল, হ্যাঁ, করেছি। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হিসেবে এটা আমার কাজের মধ্যে পড়ে। উপযুক্ত কাগজপত্র আর কারণ দেখিয়ে অ্যাপ্লাই করলে তুমিও লোন পেতে পারো।
রাগে ঝলসে উঠল সবিতা—উপযুক্ত কারণ! মক্ষিরাণী মিসেস রাউত কী জন্য লোন নিয়েছে তুমি জানো না? আমি ওকে মুখের ওপর অপমান করার পরও সে কোন্ সাহসে দেখা করে তোমার সঙ্গে অপিসে? তুমি না আস্কারা দিলে?
গৌরাঙ্গ ফের সেই শীতল, আপাত নম্র কণ্ঠে বলল, তোমার সঙ্গে ওঁর কী বিবাদ আছে সেটা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার হিসেবে তো আমার দেখার কথা নয়। ব্যাঙ্কে শি ইজ মাই ক্লায়েন্ট্।
আর নীতু চৌধুরীর বাড়িতে শি ইজ ইয়োর লাভার, তাই তো?
ঠিক তখন শপাং করে গৌরাঙ্গর সেই প্রথম, রাগী চড়টা এসে পড়েছিল সবিতার গালে। দৃপ্ত, সমর্থ চড়। আত্মরক্ষার্থে দোষী লোক এভাবে আঘাত করতে পারে না। তারা অনেক নাটক করে। এক ধরনের মেয়েলিপনা যা। হয়তো মারধরও করে। ওদের রাগ আছে, লজ্জাবোধ নেই। গৌরাঙ্গ সে জাতের লোক নয়। ওর অভিমান আছে। স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে! এ টোটালি পজিসিভ। সবিতার বিরুদ্ধে হয়তো একরাশ ক্ষোভও আছে। সেই সঙ্গে একটা গা শিরশিরে ভদ্রতাবোধও আছে। ও যে কারও সঙ্গে ঢলাঢলি করবে না তার জন্য যতটা দায়ী সবিতার প্রতি ওর ভালবাসা প্রায় ততটাই দায়ী ওর ভদ্রতাবোধ। অবৈধ সম্পর্ক গড়ার চেয়ে ওর পক্ষে ঢের সহজ প্রেমে পড়া।
এসব বুঝে সবিতা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার কখনো আশঙ্কা হয় না হঠাৎ কারও প্রেমে পড়ে যেতে পারো?
নির্লিপ্ত স্বরে গৌরাঙ্গ বলেছিল, না। তাহলে আরেকটা প্রেম থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে হবে। সেটা আরও কঠিন।
তাহলে সবিতা কখনও মিসেস রাউত, কখনও অনিন্দিতা বোস ইত্যাদি চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে গৌরাঙ্গকে আক্রমন হানল কেন? সবিতার নিজের ধারণা—

একজন মহিলা গৌরাঙ্গর মুখের চাদরটা ঈষৎ সরিয়ে দিতে জোরালো, মেয়েলি কান্নায় ভেঙে পড়েছে সারাঘর। সবিতাকে বাদ দিয়ে সব মহিলাই কাঁদছে। দু-একজন পুরুষ তাদের সামলে নেবার চেষ্টা করছে। একজন ভদ্রলোক পাশের বাড়ির প্রৌঢ় উকিল মিত্তির মশাই ওর পাশে এসে বসলেন আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে। মা বলে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেছেন ভদ্রলোক। সবিতা কাঁদছে না দেখে উপস্থিত কেউ-ই প্রায় নিজের অভ্যস্ত কর্তব্য পালন করতে পারছে না। শুধু ওদের স্বার্থেই কি সবিতার একটু কাঁদা দরকার? সবিতা চোখে আঙুল ছুঁইয়ে দেখল জায়গাটা বেশ শুকনো। শ্যুটিংয়ের ফ্লোরে অভিনেত্রীদের এরকমটা হলে চোখে গ্লিসারিন দেওয়ার রেওয়াজ আছে। তেমন কিছু করতেও সবিতার আপত্তি ছিল না যদি তাতে গৌরাঙ্গ হেসে উঠত।

এক মুখ চোখের জল মুছতে ঘরে ঢুকলেন মিসেস রাউত। এসে বসলেন সবিতার পাশে। দামি পারফিউম আর ঘামে মিশে বেশ এক বোঁটকা গন্ধ ছড়াচ্ছেন ভদ্রমহিলা। এরকম গন্ধের দেহের প্রতি কোনও আকর্ষণই থাকার কথা নয় গৌরাঙ্গর। ও সুগন্ধ ঘৃণা করত। সামান্য গন্ধের বিলাসিতা শুধু মলয় চন্দন সাবান। আজ সারা মুখ জুড়ে চন্দন মাখা হবে ওর। বোন শ্রীরাধা বোধহয় মনে মনে তৈরিও হচ্ছে। যেমন ভাবে সারা মুখে চন্দনের আলপনা এঁকে দিয়েছিল শ্বশুরমশাইকে।

কিন্তু হায়! গৌরাঙ্গর আর মুখ বলে কী রইল? এক মাথা ব্যান্ডেজ। আর তাই দেখেই কত অনুভূতি সবার। পাশ থেকে সবিতার হাতে সামান্য চাপ দিয়ে মিসেস রাউত বলছেন, বি ব্রেভ। সবিতার হঠাৎ ভীষণ ইচ্ছে করল ওকে জিজ্ঞেস করে ব্যাঙ্কের লোনে আপনার ম্যাসাজ পার্লারটা কি চালু হয়েছে? হেলথ্ ক্লিনিক না ছাই! ওসব হল বদমাসির জায়গা। কিন্তু এসব বলার কোনওই মানে হয় না সবিতার। দেয়ার ওয়াজ নাথিং বিটউইন গৌরাঙ্গ অ্যান্ড হার। ভদ্রমহিলার খানিকটা আদিখ্যেতা ছিল ঠিকই, কিন্তু গৌরাঙ্গকে নিয়ে দশ-বিশ রকম ভাবার একটা গোপন-

সুখ ছিল সবিতার। ওকে নষ্ট ভেবে আক্রমন করতে পারলে নিজের নিরাপত্তা বোধ অনেক বাড়ানো যেত। সন্তান ধারণে অক্ষম নারীর যে ভীষণ নিরাপত্তা দরকার!

গলায় একটা বাষ্পরোধের ভাব এই প্রথম হল সবিতার। গৌরাঙ্গ বলত, এত ভাবার কী আছে? মনে কর আমিই তোমার ছেলে।

আর তুমি আমাকে কন্যা ভেবে নাও?

তাই বা মন্দ কী?

আর সেই কন্যার বিবাহ দিতে হলে?

হা হা করে হাসতে হাসতে বিছানায় গড়িয়ে পড়ত গৌরাঙ্গ। তারপর হাসির দম ফুরিয়ে যেন সবিতাকে আশ্বস্ত করতেই তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বলত, আমারও একটা ডাক্তারি টেস্ট করালে হয় না?

সবিতার কাছে এটাই ছিল অপমান। নিজের অসুবিধেগুলো পরিষ্কার জানে সবিতা। গৌরাঙ্গর এই সহানুভূতির প্রয়াসকে খুব মেকি লাগত তখন। ফলে বলেই ফেলল একদিন, টেস্টের কী দরকার? অন্য কোথাও পয়দা করোনা গিয়ে!

তখন চিৎ হয়ে চোখ বুজে গাল হজম করত গৌরাঙ্গ। ঠিক যেমনটি শুয়ে এখন সমস্ত অপমানের অপেক্ষায় বাবুটি। নাকের ওপর দুটো মাছি ঘুরছে। অন্যরা হাত নেড়ে তাড়াচ্ছে অথচ ওর নিজের কোনও হুঁশ নেই।

জীবৎকালেই হুঁশ এত কমে গেল কেন গৌরাঙ্গর? এত মাপা মাপা কথা, আচরণ যার, সে পকেটে করে ঘুমের বড়ি নিয়ে অপিসে গেল কেন? আর একটা না, দুটো না, ষোলটা বড়ি জলে গুলে খেল কী ভেবে? এই ডোজের পর মানুষের ঘুম কখনো ভাঙে না ও ভালই জানত। সবিতা নিজে কোনদিন দুটোর বেশি তিনটে বড়ি খেয়ে ঘুমোলে পরদিন বেলা দুটোর আগে জাগতে পারত না। সেই লম্বা ঘুমগুলোকে গৌরাঙ্গ বলত সুইসাইডাল টেণ্ডেন্সির লক্ষণ। ঘুমের বড়ির থেকে একটা অস্বাভাবিক মৃত্যুভয় ছিল গৌরাঙ্গর। মাঝে-মাঝে রেগেমেগে বলেওছে লোকটা, একদিন কেউ থাকবে না। হয়তো ওই ঘুম ভাঙাবার জন্য সেদিন বড্ডবেশি নিদ্রা হয়ে যাবে যে।

ওই দীর্ঘ ঘুমটাই এখন যা কিছু ভরসা সবিতার। গৌরাঙ্গ নেই, কাজেই কেউ ভাঙাবেও না। আর যে ভাঙতে পারত, সেই নীতু চৌধুরীর দু'দিন ধরে পাত্তা নেই। দ্যাট সোয়াইন! অন্তত তিনবার সবিতাকে ঘুম পাড়িয়ে ওর বিছানা থেকে উঠে গেছে রাস্কেলটা। পৃথিবীতে স্বামীর হিতাকাঙ্খীর থেকে বড় শত্রু কেউ নেই মেয়েদের।

ওহ্! কী ভাষা লোকটার।…তোমার হাজব্যান্ডের মত গুনী ছেলে ব্যাঙ্কিং লাইনে বিশেষ নেই। অল হি নিউজ ইজ এ লিটল মোর ড্রাইভ। সবিতা বলেছিল, সবার তো সমান উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না। মিস্টার চৌধুরী।

তাহলে তুমি কী করতে আছ? স্পার হিম। জাগাও ওকে। সোশ্যালাইজ হিম। ব্রিং হিম টু দ্য রাইট স্পটস। আর তারপর দেখো কীভাবে ডিপোজিট বাড়ে ওর ব্রাঞ্চে। সেট হিম এ টার্গেট।

সবিতা জানত, গৌরাঙ্গর সামনে লক্ষ্য তুলে ধরার অর্থ হল, নিজেকে নীতুর লক্ষ্য হিসেবে সঁপে দেওয়া।

না, লোকটা শেষপর্যন্ত এলো কিন্তু। ভাগ্যিস আজ রবিবার, আপিস নেই। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা। হাতে চিরা-চরিত সেই আগুননেভা ব্রায়ার পাইপ। দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে দেখছে নিজের বলিকে। হয়তো অনুশোচনা হচ্ছে, হয়তো নতুন ফন্দি গজাচ্ছে। এ হল সেই ধরনের এক সফল লোক যে-সমস্ত অঘটনের মধ্যেও একটা সুসমাচরের বিদ্যুৎঝলক দেখে। ওকে কুড়িটা ঘুমের বড়ি গুলে এক গ্লাস সরবৎ বানিয়ে দিতে পারলে তৃপ্তি হতো সবিতার। নীতু চৌধুরী বসার জায়গা না পেয়ে জ্যাঠা মশাইয়ের সোফার হাতলে তেরছা হয়ে বসল। লোকটার শুয়ে শুয়ে বদভ্যাস হয়ে গেছে। দাঁড়াতেও কষ্ট হয়।

কিন্তু সবিতার কী ঠেকা ছিল নীতু চৌধুরীকে প্রশ্রয় দেবার? স্রেফ গৌরাঙ্গর উন্নতি। জীবনে একটা সাফল্য দরকার ছিল লোকটার। যা নিয়ে সবিতা গর্ব করে বাপের বাড়িতে বলবে। যারা কোনদিন বিশ্বাস করেনি সন্তান না হওয়াটা স্রেফ তাদের মেয়ের একটা অক্ষমতা। সবিতার দাদাও কি বলেনি সুযোগ বুঝে, গৌরাঙ্গরও

উচিত, একটা পরীক্ষা করে নেওয়া? কত ভাবেই যে কত কি ঘটে যায়।

নীতু চৌধুরীর পাইপ চিবোনাটা ভীষণ দৃষ্টিকটু লাগছে সবিতার কাছে। লোকটার শোক বলে কিছু থাকতে পারে না। কী করতে এল তাহলে। গৌরাঙ্গর প্রোমোশনের পরদিনও এই পোশাকে, পাইপ হাতে এসে পড়েছিল। পিঠ চাপড়ে বলেছিল, নাও ইউ আর বিগ ম্যান ব্যানার্জি। জবাবে কথা আটকে গিয়েছিল গৌরাঙ্গর। কোটি কোটি টাকার ডিপোজিট অর্গানাইজ করে দিয়েছে যে শুভাকাঙ্ক্ষী, তাকে আর কী বলে ধন্যবাদ দেওয়া যায়। ও গোবেচারা মুখে তাকিয়েছিল সবিতার দিকে। সবিতা বিব্রত চোখে তাকিয়ে ছিল টিভি-র পর্দার দিকে।

সবিতা এই প্রথম প্রকৃত তাকাল গৌরাঙ্গর মৃত মুখের দিকে। গলার রুদ্ধ বাষ্প বোধহয় বুকে নেমেছে এতক্ষণে। প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে বুকের ঠিক মাঝখানটায়। চোখে জল নেই, কিন্তু বুকের ভালোবাসাটা যাবে কোথায়। গৌরাঙ্গ, তুমি সব জানতে। কোনো চেষ্টা না করেও বহু জিনিস জেনে যাবার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল তোমার। কিন্তু তুমি বারণ করতে চাওনি। তুমি ধরে নিয়েছিলে ওটা আমি নিজের সুখের জন্য করি। আমার অক্ষমতার জন্য নিজেকে দায়ী করার অভ্যেস ছিল তোমার। সেদিন মিসেস রাউতকে নিয়ে নাটক করলাম, তুমি খুব নির্বিকার ছিলে। মহিলার মাধ্যমে তুমি জেনেছিলে তোমার উন্নতি ঘটাতে। নীতু চৌধুরী আর আমি কী যৌথ অভিযানে নেমেছি। সেদিনের সেই চড়টা তুমি শেষঅব্দি কেন মেরেছিলে আমি আজও জানি না। না, ভুল বললাম। এই মুহূর্তে বোধহয় জানতে পারলাম কেন। ভনিতা করে ভাব করেছিলাম তুমি যেন খুব বোকা। কিছুই বোঝো না। আমারই ভুল, আমি তোমার উপকারে আসতে চেয়েছিলাম নিজেকে বাজি রেখে। আসলে, গৌরাঙ্গ, তোমার মৃত্যুটা আমারই হওয়া উচিত ছিল। তুমিই না ছক কষে বলতে যে, তোমার জীবনে দুটো বিয়ে আছে? কিন্তু ছক কষে যেটা জানতে

পারোনি তা হল যে, আমার দুটো মৃত্যু আছে। একটা তোমার জন্য, দ্বিতীয়টাও তোমার জন্য।

সবিতা সোফা থেকে উঠে পাশে শোবার ঘরে গেল গৌরাঙ্গর বইয়ের আলমারির পাল্লা খুলে এক থাক বইয়ের পিছন থেকে ঘুমের ওষুধের শিশিটা বার করল। কত বাহানায়, কত প্রেসক্রিপশন কষিয়ে যোগাড় করা ওষুধ। যত সারায় তত মারে। ঘুম পাড়ায় আবার জাগতেও দেয় না। ঘুমের বড়ি খেয়ে সবিতা ঘুমোয় দেখে বিরক্ত গৌরাঙ্গ একদিন বলেছিল, স্যাঁকরার টুকটুক, কামারের এক ঘা। আমি খেলে পুরো শিশি ফাঁক করে দেব।

কিন্তু না, গৌরাঙ্গ নিজেকে মেরে ফেলার লোক কোনদিনও ছিল না। ও কেন মরল সে ও-ই জানে কিংবা এই খামবন্ধ চিরকুটে বলে গেছে হয়তো। পুলিশ পড়েছে চিঠিটা, তারপর এনে দিয়েছে সবিতাকে। বলেছে কাউকে দোষী করেনি গৌরাঙ্গ। দোষ দিয়েছে শুধু নিজেকে।

নিজেকে? নিজের কী দোষ গৌরাঙ্গর? বৌয়ের মদতে উন্নতি? সে দোষ তো সবিতার। সবিতা গৌরাঙ্গর রবীন্দ্র রচনাবলীর নবম খণ্ড থেকে খামটা বার করল। দু'দিন ধরে চেষ্টা করে খুলে পড়তে পারেনি। অথচ চিঠিটা পড়লে মানুষটার মুখের দিকে পরিষ্কার করে চাইতে পারছে না সবিতা। লোকটা সত্যিই কী বলতে চেয়েছিল?

সবিতা খাম খুলে, ভাঁজ খুলে ছোট্ট চিঠিটায় চোখ ফেলল—

সবিতা,

আমার মৃত্যুর জন্য শুধু নিজেকেই দায়ী করছি। আমি জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেমে পড়েছি। অনেকদিন আগে তোমাকে বলেছিলাম যে, দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়তে গেলে প্রথম প্রেমটি থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। যা খুব মুশকিলের। এখন দেখছি সেই অসাধ্য সাধিত হয়ে গেছে। তবে একটু বিস্ময়করভাবে। কারণ প্রথম প্রেম থেকে আমি এখনো মুক্ত নই। অথচ দ্বিতীয় প্রেমটিও বড় প্রবল। কারণ সেটা নিজের সঙ্গে। হ্যাঁ, উন্নতি হয়ে মস্ত বড় পদে এসে আমি নিজেকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে শুরু করেছি।

আই ফিল সাকসেসফুল। আমার খুব কদর এখন সবখানে। এমনকি, নিজের কাছেও। নিজেকে খুব ভাল লাগে আমার এখন। সব সময় খুব ঋণী লাগে তোমার কাছে। জানি তো, কত স্বার্থ-ত্যাগ তোমার আমার জন্য। অথচ নিজের প্রতি ভালবাসা আমাকে আর আগের মতো ভালবাসতে দেয় না তোমাকেও। আর এভাবে তোমার প্রতি নিত্যদিন অবিচার করতে আমার একটুও ভাল লাগছে না। রাতে আজকাল এত স্বপ্ন দেখি যে ভাল করে ঘুম হয় না। অসম্ভব সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন। অথচ তার কোথাও তুমি নেই। আমি আপিসের চেয়ারে বসে বাতানুকূল পরিবেশেও স্বপ্ন দেখি। এই অত্যন্ত আরামদায়ক গদিটা ছেড়ে বাড়ি ফিরতেও আমার কষ্ট হয়। দরকারি কাগজপত্র সই করার ফাঁকে-ফাঁকে আমি সংলগ্ন টয়লেটে গিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখি। আর তখন খুব কষ্ট হয় তোমার জন্য। তারপর রাগ হয় নিজের ওপর। বেশ কদিন উল্টোপাল্টা রেজার ঘষে দিয়েছি গালে। কিন্তু ওগুলো মহড়া মাত্র। আসল বিদায় আমি তোমার এবং আমার কাছ থেকে নিতে চাই নিজের গদিতে বসে। সাতমাস আগেও যে গদিটাকে মনে হতো স্বর্গের সিংহাসন। চাওয়া-পাওয়ার বাইরে।
আমি কিন্তু তোমার ঘুমের বড়ি ধার করিনি। প্রত্যেক মাসে তিনটে করে কিনে এক জায়গায় জড়ো করেছি। নিজেকে এত ভালবাসলে খুব স্নেহমমতা দিয়ে বিদায় দেওয়া উচিত। তোমার প্রতি ভালবাসা থেকে ছাড়া পেতে পারলাম না বলেও একটু দেরি হল। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে জাগিও না। প্রেমের লড়াইটা অমীমাংসিত থাকতে দাও।

ইতি
গৌরাঙ্গ

সবিতা চিঠিটা পড়ে খামে ভরে রবীন্দ্র রচনাবলীর নবম খণ্ডে গুঁজে রাখল। ঠিক তার পিছনে রাখার ইচ্ছে হল ঘুমের বড়ির শিশিটা। কিন্তু আপনা থেকে আঙুলগুলো চেপে বসছে তাতে। সবিতা নিজেকে বোঝাল—এভাবে নয়, এখন নয়। অনেক সময় হবে

আগামী দিনগুলোর মধ্যে। অনেক আরামে, নিভৃতে ঘুমিয়ে পড়া যাবে। সারা সকাল থেকে বেঁধে রাখা কান্নাটাকে এখন উজার করতে পারলে সর্বদিক বাঁচে।

আলমারি বন্ধ করে বসার ঘরে এসে স্বামীর মুখের ওপর মুখ এনে হঠাৎ এক বিকট শব্দ করে কান্না শুরু করে দিল সবিতা। শরীরের সমস্ত সঞ্চিত জল যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে দুটো চোখ দিয়ে। কিছু রক্তও যেন জল হয়ে মিশেছে তাতে।

প্রায় এক ঘণ্টা, ক্লাসের ছয় ইঞ্চি উঁচু প্ল্যাটফর্মটার ওপর মস্ত টিচার্স টেবিলে আলতো করে হাত ঠেকিয়ে ওর এক প্রিয় পোজে নিরাবরণ দাঁড়িয়েছিল করুণা। এবার সামান্য একটু বিরতি হতে ও ঝটপট নেমে পড়ে ঘরের কোণে এক চেয়ারে টাঙ্গিয়ে রাখা শাড়িটা দেড় পাকে জড়িয়ে ফেলল শরীরে। ক্লাসভর্তি ছাত্রছাত্রীর সামনে খোলামেলা দেহে পোজ করায় এতটুকু সঙ্কোচ নেই করুণার। কিন্তু কাঠের পাটাতনটার থেকে নেমে মাটিতে পা রাখলেই কি করে, কি করেই জানি লজ্জার ভাবটা ফিরে আসে ওর। ওর তখন প্রথমেই হাত যায় শাড়িটার দিকে। অল্প একটু বিশ্রাম, তাই সায়া বা ব্লাউজ পরার আদিখ্যেতার মধ্যে যায় না ও। গায়ে শাড়িটা জড়াতে পারলেই শান্তি না হলে গা শিরশির করে।
সামনে বেঞ্চিতে বসে থার্ড ইয়ারের অরুণ ওকে আঁকছিল। আসলে আঁকার থেকে ভাবছিল বেশি। এই গরিব না খেতে পাওয়া শরীরটার থেকে একটা ফর্ম বা আকার ও পায় ঠিকই, কিন্তু কোনও রোমাঞ্চ পায় না, যা ছবির নুডে সঞ্চারিত করা যায়। মাঝেমধ্যে স্যার এসে পাশে দাঁড়ান, একটু ঘাড় নুইয়ে অরুণের কাজ দেখেন। দুটো একটা মন্তব্য করেন তারপর পাশের ছেলেটির দিকে চলে যান। আজ ওর স্কেচের ঢং দেখে স্যার বলছিলেন, অরুণ দেখছি একটা সোস্যাল কন্টেন্ট আনতে চেষ্টা করছ নুডে। অরুণ নিজেও খুব নিশ্চিত ছিলনা ব্যাপারটা সম্পর্কে, তাই তড়িঘড়ি বলে উঠল, তাই মনে হচ্ছে নাকি স্যার? রাজেনবাবু আর কিছু না বলে পাশে সরে গিয়েছিলেন।
শাড়িটা কোনমতে সবে গায়ে জড়িয়েছে করুণা যখন অরুণ একটা আধুলি ওর হাতে দিয়ে বলল, ক্যান্টিনে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে

এসো। করুণা আধুলিটা নিয়ে বলল, আমার কাছে ভাঙানি নেই। অরুণ বলল, দরকার নেই খুচরোটা রেখে দিও। তারপর চারমিনারের প্যাকেটটা জীনসের পকেট থেকে দু'আঙ্গুলে টেনে বার করতে করতে ক্লাসের বাইরে পা বাড়াল।
করুণাকে আঁকতে আঁকতে আজকাল প্রায়ই মনে হয় অরুণের যে কোথাও যেন একটা অন্যায় আছে এই ব্যাপারটায়। করুণাকে আঁকলে কোনও ফর্ম আঁকা হয় না, একটা কঠিন, কুৎসিত বাস্তবকেই আঁকা হয়। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ সেকথা কবুল করে না। অরুণ ক্যান্টিনে এসে কোণের টেবিলটায় বসে একটা চা চাইল। একটু বাদেই ওর সামনে এসে সুকন্যা বলল, তোর স্টাডিটা কেমন এগোচ্ছে রে অরুণ? অরুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল। কোনও ভাবে বিব্রত হলে যেটা করে থাকে ও। তারপর প্রায় নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, কিছুই হচ্ছে না রে। বডি একটা আঁকছি বটে তবে সেটা কিছু দাঁড়াচ্ছে বলে মনে হয় না। স্যার আবার আজ বললেন, একটা সোস্যাল কণ্টেণ্ট নাকি ঢুকে পড়েছে ছবিতে। কি জানি বাপু। সুকন্যা ঠোঁট থেকে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, দ্যাখ, এই দু-তিন টাকা ঘণ্টার মডেলদের থেকে আর কি বেশি পাব আমরা বল? এবার একটা দুষ্টুমি ভর করল অরুণের মাথায়। ও একটা মুচকি হাসি ঠোঁটে মাখিয়ে বলল, শান্তিনিকেতনে তো ছাত্রছাত্রীরাই নিজেদের মধ্যে মডেলিং করে। এখানে কেন যে চালু করে না সেটা। করলে কি দোষ ছিল জানি না।
সুকন্যা বেশ বিব্রত হয়েছিল অরুণের কথায়। ও সঙ্গে সঙ্গে অনুযোগের সুরে বলল, শান্তিনিকেতন আর আমাদের এখানকার পরিবেশ এক নয় তুই জানিস, সব জিনিস সব জায়গায় চলে না। সুকন্যাকে আরও খানিকটা বিব্রত করার সুযোগটা ছাড়তে ইচ্ছে করল না অরুণের। ও ফের বলল, কলেজের পরিবেশ তো কলেজের পরিবেশ। সেখানে শান্তিনিকেতন, কলকাতা এত সব ভাবার কি আছে? সব জিনিসকেই বেলেল্লার চিন্তা করা হবেই বা কেন? এক শ' দেড়শ' মাইলের মধ্যে সমাজ কি এতখানি বদলে গেছে?

এবার কিন্তু ততটা বিব্রত হল না সুকন্যা। ওর মনে হল অরুণের কথাটারও কিছু যুক্তি আছে। সব সময় কিছুটা উলটো কথা বলার স্বভাব হলেও অরুণ মাঝে মধ্যেই সুকন্যারও মনের কথাটা ব্যক্ত করে দেয়। তবু ওর ভয় হল পরপর না জানি ছেলেটা কি বলে বসে। তাই কথাটা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বলল, এখানে সে পরিবেশ থাকলেও ভাবিস না তোর সামনে আমি জামা খুলে পোজ দিতাম। তারপর কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে হুটহাট করে ক্যাণ্টিন ছেড়ে বেরিয়ে গেল সুকন্যা।

ক্লাসে ফিরতেই অরুণ দেখল করুণা ফের ওর পোজ মতন দাঁড়িয়ে গেছে। টেবিলের পাশে মুখটাকে ঈষৎ ডান কাঁধের ওপর হেলিয়ে। রাজেনবাবু পিছনের দেওয়ালের দিকে দাঁড়িয়ে মুখে বলে বলে ওকে সেই পূর্বের ঢং-এ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছিলেন। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে নিজের জায়গায় বসতে বসতে অরুণ অনুভব করল ওর চোখ দুটো আর মগজটা ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসছে। ওর কি জ্বর আসছে? কিন্তু হঠাৎ এভাবে জ্বরই বা আসবে কেন? তবু বসল অরুণ ওর বেঞ্চিতে, আর নুড স্কেচটার দিকে গভীর মনো-যোগ দিয়ে দৃষ্টিও ফেলল। কিন্তু দেখতে থাকল সম্পূর্ণ অন্য এক দৃশ্য।

ঘাটশিলার সীতানাথ জেঠু বাড়ির বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে চেয়ারের হাতল দুটির ওপর বড়সড় একটা ড্রইং বোর্ড ছড়িয়ে তাতে সাদা কাগজ ফেলে সবুজ খেত, টিলা আর নদীর দৃশ্য আঁকছে। পাশে একটা ছোট্ট টুলে বসে ছোট্ট অরুণ। অরুণ মনে মনে জেঠুর ছবি আর বাইরের দৃশ্য মেলাচ্ছে, কিন্তু মিলছে না বিশেষ কিছু। খেত আর টিলা অরুণও দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু সুবর্ণরেখা তো সামনের খেতের পাশ দিয়ে বয়ে যায়নি। নদী দেখতে হলে ওই খেত পেরিয়ে আরও দশ মিনিট হাঁটতে হবে উত্তরে। জেঠু অবশ্য ভোরবেলায় সূর্য ওঠার আগেই একবার করে হেঁটে আসে নদীর পাড় ধরে। বার কয়েক অরুণও গিয়েছিল সঙ্গে। মাঝে-মধ্যে জেঠু জলের পাশে পাথরের চাঁইয়ের ওপর পায়ের ওপর পা তুলে বসে এক মনে তাকিয়ে থাকে জলের দিকে। তখন যে জেঠু

কি হাতিঘোড়া ভাবে তা এক জেঠুই জানে। অরুণ এও বুঝতে পারছে যে, যে নদীটা জেঠু আঁকল এখন সেটা ঠিক ওর দেখা নদীটার মতন নয়, তবে আদলটা একই। নদীর পাশের পাথর-গুলো জেঠু আঁকেনি, সবুজ ঘাসই গড়িয়ে গেছে জল অব্দি। টিলাগুলো অবশ্য যেমন দেখা যায় তেমনই আছে। কিন্তু আর যেটা জেঠু এঁকেছে এই মাত্র সেটা নিয়েই অরুণের যা কিছু চিন্তা আর দুর্ভাবনা। জেঠু ছবির সামনের দিকে ডান পাশে একটা মস্ত গাছ এঁকেছে যা দূরের টিলাগুলোর চেয়েও আকারে বড়। আর সেই গাছের নিচে হেলান দিয়ে বসে একটা সাঁওতাল মেয়ে। মেয়েটার শাড়িটা গা থেকে খসে গিয়ে একটা অসভ্য ব্যাপার হয়েছে। অরুণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মেয়েটার বুক। সাঁওতাল মেয়েরা প্রায়ই রাস্তা দিয়ে খালি খালি গায়ে যায়, অরুণ সে সব ঢের দেখেছে। কিন্তু আজ ছবিতে মেয়েটিকে ওভাবে দেখে ওর লজ্জা হচ্ছে। আর দুর্ভাবনা হচ্ছে মেয়েটির মুখ দেখে। মুখটা একেবারে মিন্নার মুখ, যে সাঁওতাল মেয়েটা দুপুরে ঠিকে কাজ করতে আসে জেঠুদের বাড়িতে। মিন্নার হাসিটাও অবিকল ওরকম। হাসলে গালে টোল পড়ে। অরুণ অস্ফুটে একবার বলেও ফেলল, জেঠু, এটা কি মিন্না ?
জেঠু শুনতে পায়নি, এঁকেই যাচ্ছিল। গরমের ছুটিতে দু'মাস যখন ঘাটশিলা আসে তখন এটাই একমাত্র নেশা জেঠুর। সকালে বেড়ানো আর সারাদিন ছবি আঁকা। অরুণ পা টিপে টিপে সরে গেল বারান্দা থেকে।
কিন্তু ছবির মিন্নাকে দেখে মাথায় ভূত চেপেছে অরুণের। ওর জানতে ইচ্ছা করছে মিন্না সত্যি কিরকম। এতদিন যাকে রোজ রোজ দেখে আসছে অরুণ হঠাৎ তাকেই কেমন যেন অচেনা মনে হচ্ছে ওর। দুপুরে সবাই যখন খেয়ে ঘুমুচ্ছে আর জেঠু নিজের খাটে শুয়ে শুয়ে ড্রইং করছে অরুণ বাড়ির পিছনে ঝি চাকরদের কলঘরের পাশে পাঁচিলের ওপর গিয়ে বসল। আর তার একটু পরেই দিনের কাজ শেষ করে মিন্না এলো কলঘরে চান করতে। পাঁচিলে অরুণকে দেখে হেসে বলল, উখান থিকে পড়ো নাইকো

খোকাবাবু। পা ভেইঙ্গে যাবে। তারপর নিজেদের ভাষায় কি একটা গান গাইতে গাইতে কলঘরে ঢুকে গেল। অরুণ নিশ্চিন্ত হল, না, ও ওখানে বসলে মিন্না রাগ করবে না। ও এবার আড়চোখে কলঘরের ভেতরটা দেখল। জানালা নেই বলে পাঁচিলের দিকে দেওয়ালের কিছুটা হাঁ হয়ে আছে। আর চোখ ফেলেই চমকে উঠল অরুণ। মিন্না ওর লাল-সাদা ডোরায় শাড়িটা খুলে এক পাশের দড়িতে ঝুলিয়ে একবারে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও জানে অরুণ ওকে দেখছে কিন্তু তাতে ওর লজ্জা হয়নি। অরুণ এবার চোখ বড় বড় করে মিন্নাকে দেখছে। মিন্নাও অরুণের দিকে চোখ রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। হয়তো ও ভাবছে খোকাবাবুর কি হল? কিন্তু ও নড়ছে না। আর অরুণ একেবারে অবাক হয়ে দেখছে একটা বড় মেয়ের এই অদ্ভুত ন্যাংটো চেহারা।

এরপর মিন্না ঘুরে গিয়ে চৌবাচ্চা থেকে মগে করে জল নিয়ে ঢালতে লাগল মাথায়। অরুণ পাঁচিল থেকে নেমে বৈঠকখানায় গিয়ে চুপচাপ বসে রইল এমনি এমনি। কিন্তু এমনি এমনিও নয়, শুধুই ওর চোখে ভাসছে মিন্নার শরীরটা। খুব লজ্জা হচ্ছে ওই জিনিসটা ভাবতে অরুণের, কিন্তু ওই কথাটাই বারবার ভাবছে ও। কলতলায় মিন্নার ছবিটা বারবার ভেসে উঠছে চোখে। কপালটা ওর গরম গরম লাগল। ও হাত দিয়ে কপালটা ছুঁলো। এরকমটা ওর কখনও হয়নি আগে।

অরুণের ঘোর ভাঙল রাজেনবাবুর ডাকে। ও কি? অরুণের কি শরীর খারাপ হল নাকি? অরুণ ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে বলল, না স্যার। কাল অনেক রাত অবধি ছবি এঁকেছিলাম। একদম ঘুম হয়নি। রাজেনবাবু এবার একটু ঠাট্টার সুরে বললেন, ফিগার স্টাডির ক্লাসে এই প্রথম কাউকে ঘুমোতে দেখলাম। তা' যাক, শরীর যদি খারাপ লাগে তো এঁকো না, কিন্তু এই স্টাডি সম্পর্কে ক'দিন যাবৎ যেটা বোঝাতে চাইছিলাম সেটা শোনো। রাজেনবাবু এবার করুণার পাশে প্ল্যাটফর্মের নিচে দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, একটি পরিধানহীন, নগ্না নারী এবং

একটি ন্যুড কিন্তু এক জিনিস নয়। গায়ে কাপড় না-থাকা অবস্থায় একজন নারী বা পুরুষ যে অস্বস্তিবোধ করে, যে লজ্জা ও কুণ্ঠার দ্বারা আক্রান্ত হয় একটি ন্যুডের মধ্যে সেই অপ্রস্তুতকর অবস্থা নেই। সাধারণ নগ্নতা এক ধরনের অভাবের কথা বলে, ন্যুড কিন্তু এক সমৃদ্ধ, পূর্ণতার প্রতীক। নগ্না নারী বলতে আমরা মনে মনে বস্ত্রের অভাবে জড়োসড়ো এক নারীকে বুঝি, যার মুখ আমাদের করুণার উদ্রেক করে। ন্যুড কিন্তু একটি সুষম, প্রত্যয়ী, সমৃদ্ধ শরীর, কিংবা বলা চলে শিল্পীর সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা ও তুলিতে নবগঠিত এক বিস্ময়কর মূর্তি। আজ এই যে মেয়েটি তোমাদের সামনে…

রাজেনবাবু এবার নিজে উঠে করুণার পাশে দাঁড়িয়ে ও শরীরের ভঙ্গিমাটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন। রোগা, ক্ষয়াটে চেহারায় করুণার পাশে মোটাসোটা, বেঁটেখাটো রাজেনবাবু দাঁড়াতে দৃশ্যটা যে খুব হাস্যকর হয়ে দাঁড়াল তার সাক্ষী ছাত্র ছাত্রীদের মুখে চাপা, নিরুচ্চার হাসিগুলি। অরুণের শুধু মনে হল এরকম দৃশ্য ব্যঙ্গাত্মক ছবির পক্ষে আদর্শ। এবং তারও একটা সোশ্যাল কণ্টেণ্ট আছে। রাজেনবাবু তখন বোঝাচ্ছিলেন শিল্পীর পক্ষে ন্যুড আঁকার যথার্থ অনুপ্রেরণা কি, অরুণ নিজের অদ্ভূত ভাবনাগুলোর মধ্যে ফের ডুবে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল যখন হুড়মুড় করে ক্লাসে ঢুকে পড়ল কলেজের ছাত্রদের আস্কারা পেয়ে পেয়ে মাথায় চড়া নেড়ি কুকুর দামু। আশ্চর্যের ব্যাপার যে দামু ক্লাসে ঢোকার আগে মুখে একটা 'ঘেঁউ' আওয়াজ পর্যন্ত করেনি। সম্ভবত ক্যাণ্টিনের বেড়ালটাকে তাড়া করে ঢুকে পড়েছিল ক্লাসে, যা আগে কখনই করে নি। ক্লাসে ঢুকে রাজেনবাবু ও ছাত্র ছাত্রীদের অবাক অবাক চোখগুলো দেখে ও নিজেই কিছুটা তাজ্জব বনে গেল। তারপর সম্ভবত ওর একটু লজ্জা হল। তখন লেজ গুটিয়ে মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে ক্লাসের দ্বিতীয় ন্যুড মডেল হিসেবে বসে পড়ল। রাজেনবাবু 'হেট! হেট!' করে দুটো আওয়াজ করলেন প্ল্যাটফর্মের ওপর থেকে। ছেলেমেয়েরা হি-হি করে হাসতে লাগল। আর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে করুণাকে এই প্রথম সত্যিকারের লজ্জা

পেতে দেখল অরুণ। হঠাৎ-ই করুণা যেন টের পেয়েছে যে খালি গায়ে ওর এই অবস্থা অনেকটা ওই কুকুরটার কাছাকাছি। কাপড় পরা মানুষের চেয়ে উলঙ্গ কুকুরটার সঙ্গেই ওর মিল বেশি। প্রচণ্ড বিব্রত অবস্থায় করুণা বুঝতে পারছিল না ও ফের গায়ে কাপড় চাপিয়ে নেবে কি নেবেনা। ছেলেমেয়েদের হাসিটা তখনও বহাল আছে আর সিনেমার কমেডিয়ানদের মতো রাজেনবাবু তখনও এক বিচিত্র কণ্ঠস্বরে হেট! হেট! আওয়াজ করে যাচ্ছেন। অরুণ হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে দামুকে সজোরে এক লাথি মারল। দামু এই অভ্যর্থনার জন্য এতটুকু প্রস্তুত ছিল না, সে প্রথম লাথিটা খেয়েই কেঁউ করে এক ডাক দিল কিন্তু ততক্ষণে ওর নাকের ওপর অরুণের দ্বিতীয় লাথিটা পড়েছে। দামু এবার সমানে কেঁউ কেঁউ কেঁউ করতে করতে সিঁড়ির দিকে ছুট লাগালো। পাশের ক্লাস থেকে বীরেনবাবু বেরিয়ে এলেন কি ঘটল দেখার জন্য। রাজেনবাবু তখনও বুঝে উঠতে পারেন নি কুকুরটা সত্যি সত্যি গেল কি গেলনা। কি মনে করে করুণা বলল, আজ যাই বাবু, শরীরটা ভাল নেই! ছেলেটারও জ্বর জ্বর আছে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে তখনও রাগে ফুঁসছিল অরুণ। পারলে আরেকটা লাথি মারে দামুকে। পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে করুণা বলল, ওকে আর মেরে কি হবে দাদা? অবলা জীব। ও আর কি বোঝে? অরুণ করুণার কথার কোনও উত্তর দিল না। করুণা যখন ওর সামনে দিয়ে নেমে যাচ্ছে ওর সস্তার শাড়িতে মোড়া শরীরটা দেখে মনে হল দামু নয়, সত্যিকারের অবলা জীব করুণাই, কাপড় থাকতেও যার কাপড় খোলার এত প্রয়োজন। ঘণ্টা ধরে, প্রতিদিন।

বাড়ি ফেরার পথে অরুণ আর সুকন্যা সিগারেট ধরিয়ে সুকন্যার হাতে দিল। তারপর নিজের জন্যও একটা ধরাল। কাঠিটা নিভিয়ে জলের দিকে ছুঁড়ে মারল আর নাকমুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে থাকল। সুকন্যা সিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে নিয়েই বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর যখন অরুণ ওর দিকে মাথা ঘুরিয়ে সিগারেটের দীর্ঘ ছাই দেখে কিছু বলতে যাবে ও-ই তখন বলে উঠল, আচ্ছা, তুই আজকাল হঠাৎ-হঠাৎ এরকম মাথা গরম করিস

কেন? কুকুরটা কি এমন দোষ করেছিল যে ওটাকে ওভাবে লাথি মারতে হল?
অরুণ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, খুব তো বসে বসে আঁকলি ওকে। খেয়াল করে দেখেছিলি করুণার গলা আর কাঁধের পাশে সরু দাগ দুটো? দেখেছি বৈকি। তা' কি হয়েছে তাতে? ওদের বররা যে বৌদের ধরে পেটায় সেটা কিছু নতুন ঘটনা নয়।
দাগটা মারের নয়, দড়ির।
মানে?'
মানে, করুণা গত সপ্তায় সুইসাইড করতে গিয়েছিল।
ও মা! তাই নাকি? তা' তুই বা এসব জানলি কোত্থেকে?
অরুণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। বলল, জানি, কারণ তোদের চেয়ে চোখটা কানটা বেশি খোলা রাখি তাই। সুকন্যা এবার একটু টিপ্পনী কেটে বলল, সেজন্য চায়ের পয়সাও দিস্ দু'চার আনা। অরুণ রাগতভাবে বলল, ঠিক তাই।
কিন্তু তাতেও বুঝতে পারছি না অত খবর তুই পাচ্ছিস কি করে?
বাবা গতকাল করুণা একটা চাকরির জন্য আমার বাড়ি গিয়েছিল।
কিন্তু তুই তো মেসে থাকিস, সেখানে ও গেল কি ভেবে?
গেল। কারণ দরকারটা জরুরী।
তা' তুই কি বললি?
বললাম, আমি আর কোত্থেকে চাকরি দেব। ও বলল, এই দিনে ছয়-আট টাকায় খাওয়া জুটছে না। স্বামীটা মাতাল, একটা পয়সা ছাড়ে না। উলটে নেয়। চাকরি না পেলে ওকে ফের গলায় দড়ি দিতে হবে। আর এবার আধাআধি নয়, পুরো কাজ।
সুকন্যাও এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হাতের পোড়া সিগারেটটা মাটিতে ছুঁড়ে মেরে দুই হাঁটুর ওপর হাত দুটোকে পাশাপাশি রেখে সেই হাতে থুতনি ঠেকিয়ে বোকার মতো তাকিয়ে রইল ঝিলের জলের দিকে। একটু একটু অন্ধকার নেমেছে, আশেপাশে একটু একটু করে জ্বলে উঠছে বিজলী বাতি, আর ঝিলের জল

একই সঙ্গে কালো এবং চকমকে হয়ে উঠছে আলোর অজস্র প্রতিবিম্ব জলে। সুকন্যা বুঝে উঠতে পারছিল না স্রেফ একটা নুড মডেলের জন্য অরুণ হঠাৎ এতটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল কেন। ওদের দুঃখ দারিদ্র্য কি চাইলেই দূর করা যায়? ওই দারিদ্র্য চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবে। সুস্থ মাথায় ওসব নিয়ে ভাবার কোনও মানে হয় না। সুকন্যা অরুণকে বলল, তা' তুই কি করবি ভাবছিস? বরটাকে গিয়ে পেটাবি?

ভয়ানক শঙ্কিত কণ্ঠে অরুণ বলে উঠল, পেটাবো? তোর কি মাথা খারাপ? পিটিয়ে ওদের কাণ্ডজ্ঞান ফেরানো যায়? ' তাতে করুণারই গলায় দড়ি দেওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। না, না। আমি তেমন কিছু মোটেই ভাবছি না। যেমন করে হোক করুণাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু জানিনা চাকরিটা কোথায় আছে। কে দেবে। তোর বাবাকে একটু বলে দেখবি?

কথাটা বলেই অরুণের ভীষণ লজ্জা হল। কোনও দিনও সুকন্যার থেকে কোনও সুবিধে আদায় করার কথা ভাবেনি ও। সুকন্যার বাবা বড় কোম্পানির ডিরেক্টর বলে ওর সঙ্গে মেলামেশাতে বেশ সঙ্কোচ ছিল প্রথম দিকে। জানত অনেক গুঞ্জন হবে এখানে ওখানে হয়েছে। তার কিছু কিছু যে ওর কানে আসেনি তাও না। অথচ আজকে ব্যাপারটা কিরকম সত্যি হয়ে পড়ল। লজ্জার বশে কিছুটা নার্ভাস অরুণ আবার একটা সিগারেট ধরাল সিগারেটের শেষ আগুনটার থেকে।

সুকন্যা বলল, বলতে তো পারি। কিন্তু কি কাজ পারবে করুণা? অফিসে তো আর ঝি-চাকর লাগে না। অরুণের আশঙ্কাটাই সত্যি হল—অফিসে করুণাকে দিয়ে কোনও কাজ হবার নয়। আরও কি সব ভাবছিল অরুণ তখন সুকন্যা ফের বলল, তবে আমাদের পাড়ায় একটা কয়েল বাঁধার কারখানা আছে। মেয়েরাই কাজটা করে। দাদাকে দিয়ে বলে দেখতে পারি। যদি ওরা রাজি হয় তো তোকে জানাব।

এরপর বহুক্ষণ নীরবে বসে রইল দু'জন। অবশেষে সন্ধে সাতটা নাগাদ আকাশ যখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে অরুণ ঝট্ করে

রোয়াক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল, তোকে ট্রামে তুলে দিই। সম্ভবত এই প্রথম সুকন্যাকে নিজের থেকে বাড়ি ফেরার কথা বলল অরুণ। সাধারণত ঘটনাটা ঘটে একেবারে উল্টো। সুকন্যা বাড়ি ফিরব, বাড়ি ফিরতে হবে বাই ধরে কলেজ থেকে বেরুবার পর থেকেই, আর দাঁড়া না, এই তো সবে সন্ধে হল, এই ট্রামটা ছেড়ে দে, ইত্যাদি বাঁধা গৎ সমানে আউড়ে যায় অরুণ। অরুণের এই অসংখ্য বাহানা দেখিয়ে দেরি করানোটা ক্রমে ক্রমে সুকন্যার এত মনে ধরে গেছে যে সে সব শোনার জন্যই একেক দিন ও ইচ্ছে করেই বেশি করে বাড়ি ফেরার তাড়া দেখায়। তবে সন্ধে সাত, সাড়ে সাত, আটটার আগে ফেরা কখনওই হয় না। এমনকি, একেকদিন ট্রামে উঠে মন পড়ে থাকে অরুণের প্রতি। ছেলেটা এত উদাস, উন্মনা, অস্থির! সুকন্যার ভয় হয়, ও ঠিকঠাক বাড়ি ফিরবে তো? আর বাড়িই বা বলা যায় কি করে? থাকে তো একটা মেসে। বড় পরিবারের মা-হারা ছেলেটির বাপের সঙ্গে পটে না। বাবা চাইতেন ইঞ্জিনীয়র করতে, ছেলে পড়ছে ফাইন আর্টস। বাবার ইচ্ছে পড়িয়ে-শুনিয়ে নিজের কোম্পানীতে টানেন, ছেলের স্বপ্ন প্যারিসের রাস্তায় শিল্পী হয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘোরার। প্রায়ই বলে অরুণ, দেখে নিস সুকন্যা, আমি প্যারিসের সোন নদীর ধারে এক গাছ-তলায় শুয়ে শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব। অথচ এই উন্মাদ করা রোমান্টিসিজম ভেদ করে মাঝে মাঝেই ধরা পড়ে ওর সূক্ষ্ম সমাজচেতনা। তাই কখনও কখনও মুখ ফস্কে বলেও ফেলে, দ্যাখ, এই আর্ট-ফার্ট একধরনের নির্মম সৌখিনতা। যার পেটে ভাত নেই তার কি প্রয়োজন আর্টে? আর্ট আমাদের এই দুঃসহ জীবনের কতটুকু কি বদলাতে পারে? শিল্প তো শেষ অবধি শিল্পের জন্যই। 'আর্ট ফর আর্টস সেক' কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়।

অরুণের সব চেয়ে বড় গ্লানি যে বাবার সঙ্গে বিরোধ করেও তাকে বাবার টাকায় চলতে হয়। সে কারণে বিমল, অমিত রবীনের টিপ্পনীও ওকে শুনতে হয়। ওরা ওকে বলে শখের বিপ্লবী। কথাটা হয়তো সত্যি বলেই অরুণ তাতে মর্মে মর্মে দগ্ধে মরে।

একদিন দুঃখ করে সুকন্যাকে বলেছিল ও, জানিস তো, আমাকে যা ওরা বলে আমি আসলে তাই। আমার প্রতিবাদগুলোর মধ্যেও অভিসন্ধি থাকে। আমি ঘর ছেড়েছি তিরিশটা আত্মীয়ের সঙ্গে এক ছাদের তলায় থাকতে পারব না বলে। আমি আর্ট পড়ছি ঠিক শিল্পী হওয়ার জন্যও নয়। শিল্পীদের ওই জীবনধারা আমাকে টানে বলে। সে কথা বাবাও বলেন। বলেন, যখন পেটে টান পড়বে তখন আর জীবন ফিরে পাবার সুযোগও থাকবে না। কিন্তু সুকন্যা জানে অরুণ জাত শিল্পী। ওর রেখায়, রঙে, তুলিতে বুলিতে একটা শিল্পীমন কাজ করে। ক্লাসের একমাত্র ওর কাজেই একটা যথার্থ বেদনা আছে। যা খুশি চাইলেই ও আঁকতে পারে না। ও তাই আঁকে যা ওর ভেতর থেকে আসে। যে কারণে শুধু একটা নুড ফর্ম হিসেবে ও কিছুতেই করুণাকে এঁকে উঠতে পারছে না। সামান্য কটা টাকার জন্য মেয়েটা দিনের পর দিন এসে বিবস্ত্রা হয়ে দাঁড়ায় ভাবলেই ওর মনটা বিকল হয়ে যায়। ব্যাপারটা এমনিতে খুব যে গুরুত্বপূর্ণ তা' নয়। কিন্তু অরুণের রোমাণ্টিক মনের কাছে এই সামান্য ঘটনার যন্ত্রণাই অনেক।

সুকন্যা উঠে পড়ে ট্রাম স্টপের দিকে যেতে লাগল। সামান্য একটু অভিমান হয়েছে ওর। অরুণ আজ ওকে বাড়ি ফেরার তাগিদ দিল। ও ট্রামে ওঠার সময় এই প্রথম মাথা ঘুরিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো অরুণকে দেখল না। কিন্তু ভাগ্যিস দেখেনি। দেখলে ও মোটেই দেখত না নবীন যুবক উদাসনেত্রে প্রেয়সীর দিকে চেয়ে আছে, যেন আরও কত কিছু বলার ছিল। এই প্রথম অরুণও সুকন্যার ট্রামে ওঠা নির্নিমেষে দেখল না। বস্তুতঃ ও সুকন্যা বা ট্রাম কোনোদিকেই তাকিয়ে থাকেনি। আচমকা ওর নজর কেড়েছে করুণা ময়দানের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। সাপে যেন ছোবল মেরেছে অরুণের কপালে! এক তীব্র, তীক্ষ্ন জ্বালা ঘোরাফেরা করছে অরুণের মগজের ভেতর। ক্রমে সে জ্বালা ওর বুকে নামছে। এক অজ্ঞাত কুলশীল নারী যে কী রোজ কলেজের ক্লাসরুমে এসে উদোম হয়ে দাঁড়ায় তার জন্য এই ব্যথা যে ওর কোত্থেকে এল ভগবানই জানেন। ওর মনে হল স্বামীর হাতে নিত্যদিন ঠ্যাঙানি

তো এসব মেয়েছেলের ঘোর প্রাপ্য। এ আবার ভদ্র চাকরি কিভাবে করবে? দেহ বেচে খাওয়ার মতো সুখের চাকরি ভূভারতে কোথায়? থোঃ! থোঃ!
অরুণ একবার ভাবল, করুণার পিছনে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে যেন।
গঙ্গার পাড়ে একটা গাছের নিচে গিয়ে হেলান দিয়ে বসল অরুণ। ওর মনে পড়ল জীবনের মহত্তম শখটার কথা। প্যারিসের সোন নদীর ধারে একটা গাছের তলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। শেষ নিঃশ্বাসটা কি দীর্ঘ, প্রলম্বিত শ্বাস? আস্তে আস্তে অরুণ গাছের তলায় শুয়েই পড়ল। প্যারিস কিংবা কলকাতার আকাশের মধ্যে তো কোনও ফারাক নেই। সেই এক চাঁদ, একই তারা, একধরনের মেঘ এবং অন্ধকার। অরুণের মনে হল গঙ্গার পাড়েও মরলে কিছু মন্দ হয় না। নদীর ওপর দিয়ে বয়ে আসা এই ঝিরঝিরে বাতাস, এই ঈষৎ চন্দ্রালোক, আর দূরে ওই জলে নৌকোর দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ...
হঠাৎ সেই নির্ভুল, নির্লজ্জ হাসি। সেরকম হাসি এক বিশেষ ধরনের মেয়েরাই হাসে। তন্দ্রার ঘোর ভেঙ্গে উঠে বসতে পাশ থেকে ডেকে উঠল মেয়েটি, অরুণদা! এখানে এসে শুলেন কেন? সুকন্যাদির সঙ্গে ঝগড়া করলেন বুঝি?
অরুণ কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না এই ডাক করুণার, এই হাসি করুণার, এই অন্তরঙ্গ প্রশ্নটাও করুণার। ও শুধু বলল, তুমি...তুমি এখানে কেন করুণা?
বুঝতে পারছেন না অরুণদা?
অরুণ কিছু বোঝার চেষ্টা করছিল না। ও শুধু দেখতে চাইছিল করুণার গলার সেই দাগটা। যা নাকি দড়ির চাপে হয়েছে। কিন্তু সামান্য একটু চাঁদের আলোয় অত সূক্ষ্ম কোনও দৃশ্য ধরা পড়ে না। অরুণ জিজ্ঞেস করল, তোমার সেই লোকটি কোথায় গেল? গলার স্বরে কোথায় যেন একটা অভিমান মিশে রইল। করুণা নাক কুঁচকে বলল, বাজে লোক। শুধু দরাদরি করে। বিস্ময়ের ভনিতা করে অরুণ বলল, তাই নাকি? কত দিতে চাইছিল?

দুই।
কত নাও তুমি ?
নিই তো পাঁচ।
এরপর অরুণের মুখ ফুটে আর কথা বেরোলো না। ও পকেট হাতড়ে পাঁচটা টাকা বার করে করুণার হাতে দিল। তারপর কিছুক্ষণ থেমে বলল, চলো, ওই দিকে, মাঠের ভেতর। এদিকে বড্ড লোক।
এখন যখন নিজের হাতে বুকের কাপড়টা সরিয়ে দিল করুণার কোনও রাগ, লজ্জা বা প্রতিরোধ গড়ে উঠল না অরুণের মনেব ভিতর। ওর শুধু মনে পড়ল ছোটবেলায় দেখা জানালার পাশ থেকে উলঙ্গ মিন্নাকে। বিখ্যাত কোনও নুড ছবি নয়, শুধু মিন্নাকে। কিশোরের নিষ্পাপ চোখে দেখা সেই নগ্ন, রহস্যময় মিন্না।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ভোরের সেই মাতাল হাওয়াটা ফিরে এল তটে। মস্ত গতির হাওয়ারও বোধ হয় একটা দেহ হয়, যা অদৃশ্য আস্তরণের মত ঘিরে ফেলে চার দিক। আর তারপর যা দেখা যায় তার সবটাই কীরকম পটে রঙ দিয়ে ফোটানো ছবির মত। দ্রুত ব্রাশে টানা ছবি, যাতে গতি আছে, স্থির দাঁড়িয়ে থেকেও যেন দুলছে। তবে এ সবই মনে হওয়া। হাওয়ার তোড়ে নিজে দুলতে থাকলে দৃশ্যও তো দুলবে। কিংবা এ সব কিছুর পিছনে হয়ত কোনও স্মৃতির আন্দোলন। শিল্পী টার্নারের ছবিতে ধরা সূর্যাস্তের সমুদ্রের স্মৃতি। যার কমলা রঙ, কমলা থেকে ঘনিয়ে ওঠা লাল, তার পাশে জ্বলন্ত নীল, যা দিগ্বলয় থেকে সরে সরে গিয়ে ক্রমশ কালো আর অন্ধকার হয়ে গেছে।

হাওয়া আমাকে আর আমার স্মৃতিকে দোলাচ্ছিল। আমার পাশে শর্মিলা, কিন্তু স্থির বসে ঢেউ গুনে যাচ্ছে। দু'শ সাতান্ন…দু'শ আটান্ন…দু'শ ঊনষাট…কখন হাওয়া উঠেছে ওর খেয়াল নেই, কখন সূর্য ডুবল তাও খেয়াল করেনি, বহুক্ষণ পর একটা বড় ঢেউয়ের শেষ, শ্রান্ত ফেনাগুলো যখন ছড়িয়ে এসে ভিজিয়ে দিল ওর পা আর শাড়ির আঁচল তখনও ওর সম্বিৎ ফেরেনি। ও গুনেই চলেছে দু'শ ষাট…দু'শ একষট্টি…দু'শ…।

ও যে ঠিক কত অব্দি গুনেছে সেটাও আমার অনুমান। কারণ জল আর হাওয়ায় মিলিত গর্জনে ওর মৃদু স্বর চাপা পড়ে আছে। সেই যে কখন একটা বড় ঢেউয়ের জল এসে আমাদের প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন ও জোরে জোরে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল দু'শ। আর তারপর থেকে আমিও কীরকম সূর্যডোবা দেখতে দেখতে আনমনে আউড়ে যাচ্ছিলাম দু'শ এক…দু'শ দুই…

দু শ তিন…ইত্যাদি। আমার গোনার সঙ্গে ঢেউয়ের সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না কারণ ঢেউয়ের দিকে আমার নজরই বিশেষ ছিল না। আমি অপেক্ষায় ছিলাম কখন আকাশের কমলা আভা বেগুনি হয়ে আসবে আর গোধূলি সম্পূর্ণ হবে।
হঠাৎ চমকে উঠলাম শর্মিলার ডাকে, সোনা, শুনছ? শুধু ডাকা না, দেখি শর্মিলা আমার হাত ধরেও ঝাঁকাচ্ছে। অত প্রবল হাওয়ার মধ্যেও যে ডাক এত স্পষ্ট শুনলাম তা তো চিৎকারেই। আমি ঘুরে গলা চড়িয়ে বললাম, কী হয়েছে? জানি না আমার কথা ও শুনতে পেল কিনা, কারণ ও মুখ ফের ঘুরিয়ে নিয়েছে জলের দিকে। যেখানে শেষ ঢেউয়ের সঙ্গে বালিতে এসে আছড়ে পড়েছে ফেনায় মোড়া একটা বড়সড় মানুষের দেহ। তারপর পিছনের ছোট ছোট ঢেউয়ের ধাক্কায় উঠে এল তটের আরেকটু ওপরে। পাছে আবার কোনও ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেটাকে। আমি পড়ি কি মরি করে ছুটে নেমে গেলাম জলের ধারটায় আর নতুন কোনও ঢেউ লাগার আগেই মৃতের একটা হাত ধরে তাকে টেনে তুলে আনলাম আমাদের বসার জায়গাটায়।
দেহটা উবুড় হয়ে পড়ে ছিল। শর্মিলা বলল, অত অবাক হয়ে কী দেখছ, সোনা? এক্ষুনি পুলিসে খবর দাও। নয়ত বেড়াতে এসে নতুন কী এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব আমরা।
কিন্তু জড়িয়ে পড়তে আমার আর বাকি ছিল না। উবুড় হয়ে পড়ে থাকা মানুষটার পিঠের একটা ক্ষত চিহ্নের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে ছিলাম। একটা লম্বা, সরু ছুরির ক্ষত। যেটা দেখিয়ে ভদ্রলোক চিরকাল গৌরব বোধ করতেন। বলতেন, আমার শরীরের সামনে কেউ কোনদিন দাগ ফেলতে পারেনি। শুধু কেলে বিশে ভোজালি দিয়ে কোপ বসিয়ে ছিল পিছন থেকে। কিন্তু ওই পর্যন্তই! ওই চাকু কেড়েই ওর বুকে ক্রস এঁকে দিয়েছিলাম। তারপর গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রক্তবমি করিয়েছিলাম।
আমি হাঁটু গেড়ে বসে ভদ্রলোকের পিঠের সেই ক্ষতে হাত বোলালাম একটু। শর্মিলা চিৎকার করে উঠল, তুমি কী করছ কী? লোকটা কে? কোত্থেকে এল?

আমি দেহটাকে চিৎ করে দিতে দিতে বললাম, জগন্দা।

ছোট্ট একটু নাম—জগন্দা। কিন্তু তাই বলতেই আমার গলা বুজে আসছিল। জগন্দা তো শুধু একটা নাম নয়, একটা লোক নয়। জগন্দা আমার ছেলেবেলার একমাত্র হিরো, একমাত্র মস্তান, আমাদের পাড়ার নিজস্ব নেপোলিয়ন। যেদিন ছিনতাইবাজ কেলে বিশেকে রাস্তায় চিৎ করে ফেলেছিলেন জগন্দা আমি বাড়ির ছাদ থেকে সে দৃশ্য দেখেছিলাম। তারপর ওর চাকুটা যখন ছুঁড়ে নর্দমায় ফেলে দিলেন আমি বাঁশিতে ভোলানো সাপের মত সেই নর্দমার ঝাঁঝরির পাশে গিয়ে বসেছিলাম। চাকুর চিহ্নমাত্র নেই, অথচ আমি উবু হয়ে বসে আছি নর্দমার পাশে। পাড়ার বড় ছেলেরা বালতি করে জল এনে এনে রাস্তার রক্ত ধুচ্ছে তখন। কিছু ছেলে চ্যাংদোলা করে কেলে বিশেকে নিয়ে গেছে হাসপাতালে। কিছু ছেলে বেনজিন কি আয়োডিন দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে জগন্দার পিঠে। আর রোয়াকে বসে পিঠের যন্ত্রণা ভুলে আনমনে ক্যাপস্টান সিগারেটে টান দিয়ে যাচ্ছেন জগন্দা।

জগন্দাকে চিৎ করতেই আঁৎকে উঠল শর্মিলা। আমাদের বিয়েতে এসেছিলেন এক হাঁড়ি মিষ্টি আর এক ঝুড়ি ফুল নিয়ে। উনি যে আসবেন তা ছিল আমার স্বপ্নের অতীত। ওঁর নিমন্ত্রণ পত্রটা দিতে গিয়েছিলাম হাসপাতালে। তার কদিন আগে বেপাড়ার কিছু ছিচকে মস্তান ভোজালি আর পাইপগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জগন্দার ওপর। কিন্তু বাহান্ন বছর বয়সী মর্দানকে কাবু করতে পারেনি। সব কটাকে বেদম পিটিয়ে ঘাড়ের কাছে গুলির চোট নিয়ে জগন্দা পায়ে হেঁটে গিয়ে নিজেকে ভর্তি করেছিলেন হাসপাতালে। আমার চিঠিটা হাতে নিয়ে কেঁদে ফেললেন, দশ বছর দেখিনি তোমাকে সুমন! একবারও কি পুরনো পাড়াতে ঢুঁ মারতে সাধ হয় না? আমি তো গুণ্ডা-মস্তান নই সুমন। তোমার বাবা আমাকে কত স্নেহ করতেন জান না কি? তোমরা বড় হয়ে সব পাড়া ছেড়ে চলে গেলে আর পাড়াটাকে বুকে নিয়ে পড়ে রইলাম আমি। গিন্নি বলে হিজলদাগড়া। জগন্দা উঠে বসতে যাচ্ছিলেন। আমি ধরে শুইয়ে দিলাম। শরীরের যা

অবস্থা দেখলাম তাতে মুখ ফুটে বলা গেল না, আসবেন কিন্তু। রসিকতার মত শোনাত সেটা। কিন্তু তখন থোড়াই জানতাম যে ডাক্তারের চোখ ফাঁকি দিয়ে জগুদা চলে আসবেন অনুষ্ঠানে। আর আসবেন বাজার হয়ে মিষ্টি আর ফুল কিনে। আর এসেই ঘোষণা করবেন, এই তো এলাম! কেউ পারল ঠেকাতে?

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা জগুদাকে শর্মিলার সেই প্রথম এবং শেষ দেখা। আমার ফুলশয্যার রাত কেটেছিল শর্মিলাকে জগুদার কীর্তিকাণ্ড শুনিয়ে। রাত তিনটের পরেও যখন জগুদা, জগুদা করে যাচ্ছি বীতশ্রদ্ধ শর্মিলা বলে বসল, এতই যখন জগুদাঅন্ত প্রাণ.তখন পড়াশুনো না করে জগুদার কাছে ছুরিখেলা শিখলেই তো পারতে!

ওকে বলিনি সেদিন, কিন্তু ছেলেবেলায় অভিলাষটা ছিল সেরকমই। জগুদার মত ছুরিকে হাতে পোষা পাখি করা। ছুরিকে ইয়োইয়োর মত লোফালুফি করা। খোলা ছুরি পকেটে নিয়ে রাতে নিদ্রা যেতে পারা। কিন্তু অচিরেই জেনেছিলাম যে ছুরির জাদুকর হওয়ার বর নিয়ে সবাই জন্মায় না। ছুরি হাতে নিলেই হাত কাঁপে দেখে জগুদাই একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তুমি তো মস্ত নার্ভাস ছেলে দেখছি। ছুরি নিলে হাত কাঁপে কেন? খুনী নাকি? কাউকে মারার তাল কর? এসব তোমার লাইন না। যাও, বই পড়ো।

আমি নিচু হয়ে জগুদার মুখের ময়লা সরাতে লাগলাম। কত বুড়ো হয়ে গিয়েছিল মানুষটা! বয়স দূরে থাক, যাঁর কোনদিন মৃত্যু হবে বলে ভাবিনি। আমি জগুদার গায়ের ময়লাও আঙুলে কাচিয়ে সাফ করলাম। না, শরীরের সামনে কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই। মাথা ভর্তি কোকড়া কাঁচা-পাকা চুলের জটলার মধ্যেও কোনও আঘাত নেই, ট্রাউজারেও কোনও রক্তের ছাপছোপ নেই। আমি ওঁর প্যাণ্টের পকেটে হাত গলিয়ে দিলাম কোনও তথ্য-প্রমাণ যোগাড় করতে। কিন্তু বেরিয়ে এল শুধু একটা খাপখোলা ছুরি! মৃত্যুর লগ্নেও একটা ছুরি তাঁর সঙ্গে না থাকলেই চলছিল না?

জগুদার ছুঁড়ে ফেলা একটা ছুরির জন্য আমি একদিন একটা

নর্দমার পাশে উবু হয়ে বসেছিলাম। আজ তাঁরই শেষ দান একটা চক্‌চকে ধারাল ছুরিকে পকেটে পুরতে আমার এত দ্বিধা কেন? আমি মুখ তুলে চাইলাম পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা শর্মিলার দিকে। ও আমার দ্বন্দ্বটার আঁচ বোধ হয় পেল না। স্পষ্ট বলল, ছুরিটা তুমি রাখতে চাও রাখ। কিন্তু এখনই পুলিসে খবর দাও। পুলিস! গোপালপুর অন সি-তে পুলিস! আসার সময় স্থানীয় থানা হয়ে এসেছিলাম। ওখানকার তেলুগুভাষী ও সি-র ঠিকানা-পরিচয় দিয়েছিল এক সহকর্মী। বলেছিল, দারুণ মেজাজি লোক। পুলিস না ছাই! কবিটবিদের সঙ্গে আড্ডা মারে মেনলি। সি বিচে একটা হোটেল আছে ওর। একেবারে জলের ওপর ভর করে আছে। বারান্দায় বসে সিগারেটের ছাই ঝাড়লে জলে পড়ে। ও হোটেলে ফিল্মের শ্যুটিং-ফুটিংও হয়। গিয়ে আমার নাম করে বলবি, জায়গা হয়ে যাবে।

আমরা সেই ওসি-র হোটেলেই আছি। এক ধারে সাহেবি আমলের ওয়্যারহাউসের ধ্বংসাবশেষ, অন্য ধার ধু-ধু খাঁ-খাঁ। হোটেলেও বাসিন্দা বলতে আমরা দুজন। ঢুকেই শর্মিলা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে বসেছিল, এ তো হনিমুন করার জায়গা গো! এখানে লাঞ্চ ডিনার দিক, না দিক এ জায়গা ছেড়ে আমরা নড়ছি না।

এখন সেই শর্মিলা আমাকে পাঠাতে চাইছে ওই খেপা ওসি-র কাছে।

কিন্তু কী বলব আমি পুলিসকে? বলার কী আছে? একটা দেহ জলে ভেসে এসেছে। ফাইন! প্রতিদিন কিছু না কিছু লোক জলে ডুবে মারা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কাউকে কাউকে মেরেও ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু এই লোকটাকে কেউ মারেনি। মারতে পারে না। একে মারার মত লোক জন্মায়নি পৃথিবীতে। হয় ডুবে গেছে, নয়ত আত্মহত্যা করেছে। তবে সত্যিই যে কী হয়েছে তা জানা যাবে পোস্ট মর্টেম করলে।

চিন্তাটা আসা মাত্রই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। পোস্ট মর্টেম মানেই তো শরীরে ছুরি-কাঁচি চালানো! তার মানে জগুদার শরীরের সামনেটায় ছুরির ক্ষত বসবে। ওহ্ নো!

আমি দ্রুত দাঁড়িয়ে পড়ে শর্মিলাকে বললাম, সোনা এসব ঝুট ঝামেলায় আমাদের যাওয়া ঠিক না। তুমি একটু হাত লাগাও, আমরা বডিটা ওয়্যারহাউসে নিয়ে তুলে রাখি। পুলিস খুঁজে পেয়ে যা পারে করুক। এতে ফাঁসলে আমাদের ট্রিপটা মাটি হবে। আমার এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত যে ওকে মোটেই খুশি করল না পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। কোনও 'হুঁ না' না করেই ও লাশের হাত দুটো শক্ত করে ধরে নিল। আমি পা দুটো ধরলাম। তারপর সেই বিশাল বপু কোনও মতে টেনে তুলে গুটি গুটি এগিয়ে নিয়ে গেলাম ওয়্যারহাউসের ভাঙা বাড়িগুলোর দিকে।

ওইটুকু নিতেই দুজনের দম বেরিয়ে গিয়েছিল। কোনও মতে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে রাখলাম জগুদাকে। জগুদার ছুরিটা ফের আলতো করে গুঁজে দিলাম ওঁর পকেটে। তারপর ওঁর পায়ে মাথা ঠেকালাম। প্রণাম শেষ করে আমি আর শর্মিলা ফিরে এলাম হোটেলে। দোর দিয়েই শর্মিলা বলল, আজ আমরা আর খেতে যাব না কোথাও। বেয়ারা এলে বল কাল সকাল ছ'টায় যেন চা দিয়ে দেয়। আমি শুয়ে পড়লাম।

শ্রান্ত, অবসন্ন শর্মিলা বিছানায় শুতেই তলিয়ে গেল ঘুমে। আমি জামাকাপড় ছেড়ে গেঞ্জি-পায়জামা পরে গিয়ে বসলাম বারান্দায়। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে সমুদ্রতট, যতদূর দেখা যায়। দূরে লাইটহাউসের বাতি থেকে থেকে পাক খাচ্ছে। দূরে কিছু হোটেলের আলো জোনাকির মত মিটমিট করে জ্বলছে। সামনে সমুদ্রের ঢেউয়ের আকার ও গর্জন ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ঢেউয়ের ফেনায় ফসফরাস চমকাচ্ছে, দূরে প্রশস্ত শান্ত এলাকায় আকাশের চাঁদ হাসছে কোটি খণ্ড খণ্ড প্রতিবিম্বে। আর আমার বারান্দা ও বাড়ির আরেক ধারে ওয়্যারহাউসের ধ্বংসস্তূপে দেওয়ালে হেলান দিয়ে সমুদ্র দেখছেন অমর জগুদা।

বারান্দার ইজি চেয়ারেই বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। হঠাৎ কী এক ঢাকের বাদ্যির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ কচলে ভাবলাম ঢাক এল কোত্থেকে। ছুটি কাটাতে গোপালপুর এসে দুর্গা পুজোকে তো ফেলে এসেছি কলকাতায়। তাহলে ঢাক...

আমি ঘড়ি দেখলাম। রাত দুটো। আকাশের চাঁদ ছাড়া গোপালপুরে আর কিছুই জেগে নেই। ঘরে শর্মিলা অঘোরে ঘুমচ্ছে। একটা নতুন মাতাল হাওয়া উঠল বলে। আমি পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরুলাম। দরজাটা ফের আস্তে করে ভেজিয়ে দিলাম। তারপর সিঁড়ি বেয়ে সদরে এসে গেট টপকালাম। একটা ছোট্ট বাঁক নিয়ে ফের সেই ওয়্যারহাউসে। যেখানে একলা বসে জল দেখছে জগুদা।

আমি জগুদাকে চিনির বস্তার মত চেলে দিলাম পিঠে। ঝাঁকানিতে চোখের চশমা ছিটকে পড়ল মাটিতে। ওই অবস্থাতেই ফের নিচু হয়ে চশমা কুড়িয়ে চোখে পরে পা বাড়ালাম জলের দিকে। আমার বাল্যের হিরো জগন্ময় সোমের দেহের সামনে কেউ ছুরি চালাবার আগে তাঁকে ফের সঁপে দেব জলে। অমর শক্তিকে জল গ্রহণ করে। যে-জন্য প্রতিমার বিসর্জন হয়, মানুষের মত দাহ হয় না।

আমার শেষ দমটুকুও যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল জগুদাকে জলের পাড়ে কাঁধ থেকে নামানো মাত্র। এখন শুধু অপেক্ষা কখন জল এসে দেহ নেয়। আমি এক পা, দু পা করে পিছিয়ে কোথাও একটা এসে বসব বলে তাল করছি হঠাৎ ফের সেই ঢাকের বাদ্যি। কোথায় পুজো? কোথায় ঢাক? কোথায় বাদ্যি? আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমার আর বসা হল না। আমার মনে পড়ল জগুদার শহর কাঁপানো কালী পুজোর ভাসানের কথা। আদিগন্তহীন প্রসেশন চলেছে এপাড়া ওপাড়া হয়ে নিমতলা ঘাটের দিকে। এপাড়া ওপাড়া সেপাড়ার মানুষ শামিল হয়েছে মিছিলে। বাতি আর বাজনার লোকেই সিকি রাস্তা জুড়ে আছে। মিছিলের অগ্রভাগে খানিক বাদে বাদেই তিনতলা, চারতলা সমান তুবড়ি ফাটছে। আধ ডজন মোটর সাইক্লিস্ট ভটভট ভটভট আওয়াজ তুলে রাস্তা খালি করতে করতে চলেছে সামনে। দেবীমূর্তির লরির সামনে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সাথীর সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলেছেন জগুদা। কপালে মোটা করে রক্ততিলক কাটা। চোখ দুটো কান্নায় লাল। বিসর্জনের আগে জগুদা ধুতি-উত্তরীয় পরে মায়ের মূর্তির সামনে বসে ধ্যান করেছেন। মাঝে মাঝেই ডুকরে

কেঁদে উঠেছেন, 'মা ! মা !' বলে। জন্ম মুহূর্তেই মাতৃবিয়োগ ঘটেছিল জগুদার। 'তাই তো মানুষ হতে পারলাম না'—আক্ষেপের স্বরে বলতেন মধ্য কলকাতার প্রসিদ্ধ রুস্তম।

কিন্তু বিসর্জনের শেষ দৃশ্যটাই হত স্মরণীয়। জনা পাঁচেক যুবকের সঙ্গে দেবীমূর্তি ধারণ করে জগুদা পায়ে পায়ে নেমে যেতেন গঙ্গায়। যখন মূর্তিকে তটের দিকে মুখ করে শুইয়ে দেওয়া হত জলে এবং ধারকরা সবাই সাঁতরে ফিরে আসত সেই তখনও জগুদার কোনও হদিস থাকত না। জগুদা ডুবে যেতেন মায়ের সঙ্গে। বহুক্ষণ ডুবে থাকতেন অন্ধকার গঙ্গায়, তারপর হঠাৎ এক সময় বুদ্বুদের মতন ফুটে বেরুতেন ঘাটের কাছাকাছি। ডাঙ্গায় এসে রহস্য করে বলতেন, ভাসানের এই হচ্ছে পদ্ধতি। বুঝলে ছোকরার দল।

একটা বড় ঢেউ ধেয়ে আসছিল জগুদার শবের দিকে। যেন থাবা বাগিয়ে ধরবে। কিন্তু ওভাবে···বুকে বাধল কেমন। লোকটাকে হেঁচড়ে নিয়ে যাবে ? আমি উথলে উথলে ধেয়ে আসা ঢেউয়ের পাহাড়ের দিকে তাকালাম। অজ্ঞাত ভয়ে দমে গেল বুক। তারপরই মনে হল, যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণই ভয়। না দেখতে পেলে ? মনে হতে না হতেই এক ঝটকায় হাই মাইনাস পাওয়ারের চশমাটা পিছনে দূরে বালিয়াড়িতে ছুঁড়ে ফেলে নিমেষের মধ্যে ছুটে গেলাম লাশটার কাছে। পাঁজাকোলা করে তুললাম সেটা আর মাথা নামিয়ে কালো দেওয়ালের মত এক বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে সঁপে দিলাম নিজেদের। জগুদার কায়দায় একবার ডেকে উঠতেও পেরে-ছিলাম, জয় মা !

এক অন্ধ করা আলো এসে আঘাত হানছে চোখে। চোখ মেলতে পারছি না। তবু কানে আসছে শর্মিলার পরিচিত আওয়াজ, সোনা, ওঠো ! সোনা তুমি ঠিক আছ ? সোনা ! সোনা !

আমি শুয়ে আছি বালিয়াড়িতে, চিৎ হয়ে সূর্যস্নানার্থীদের মত। শর্মিলা আমার চোখের কাছে চোখ এনে ফিসফিস করে বলল, দেহটা আর পাওয়া যাচ্ছে না ! পুলিস খুজছে।

আবেশে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে আমার। শুধু বললাম, খুঁজুক।

শর্মিলা আমার পাশে বালিতে শুয়ে পড়ে বলল, তুমি এটা করতে গেলে কেন ? যদি···

আমার বলার মত সত্যিই কিছু ছিল না। আমি কী করেছি তা বোঝার মত অবস্থাতেও আমি নেই। আমি শর্মিলার দিকে পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম।

চোখ বুজে আলোর অত্যাচার সামলেছি; কিন্তু মাথার ভেতর তাল তাল অন্ধকার ঢেউয়ের মত উথলোচ্ছে। যেরকম ঢেউয়ের মধ্যে জগুদাকে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলাম। আর শরীর থেকে নামাতে গিয়ে টের পেয়েছিলাম লাশটা তার দুই বলিষ্ঠ হাতে চেপে ধরেছে আমার গলা !

একি ! জগুদা আমার গলা বেঁধে ফেলেছেন ? আমায় মারতে চাইছেন ? আমার নিয়েই ভাসানে যাবেন !

আর তখন বিদ্যুতের মত মাথায় খেলল চিন্তাটা—না, এ জগুদার দেহ নয় ! জগুদা মরে গেলেও আমার অনিষ্ট করতে পারেন না ! আমি ভুল মানুষের জন্য জল ঝাঁপ দিয়েছি।

আমরা ঢেউয়ের ধাক্কায় ফের আছড়ে পড়েছি তটে। নতুন এক ঢেউ আমাদের টানবে বলে ছুটে আসছে। কিন্তু লাশের হাত থেকে ছাড়াতে পারছি না গলাটা। অমানুষিক শক্তিতে লাশটা ভর করে আছে আমার ওপর। জল না টানলেও এভাবে আমার পরমায়ু শেষ হতে বেশিক্ষণ নেই। আমি লোহার মত হাতের সঙ্গে যুঝবার চেষ্টা না করে লাশের পকেট হাতড়াতে লাগলাম। ওই ছুরিটা আমার চাই।

ছোট ছুরি, কিন্তু ব্লেডের মত ধার। আমি তাই দিয়ে পাশ ফিরে কোপের পর কোপ বসাতে থাকলাম লাশের এক কব্জিতে। কতবার কুপিয়েছি নিজেই বুঝিনি। হঠাৎ এক মস্ত ঢেউ এসে গ্রাস করল দু'জনকে। জলের স্রোতে ভেসে গেল হাতের ছুরিটা। আমার মুক্তির অস্ত্র।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে আল্‌গা হয়ে ঢেউয়ের তোড়ে এক অন্ধকার থেকে আরেক অন্ধকারে ভেসে গেল মৃতদেহ। নিজেকে মনে হল খড়কুটো। যে শুধু আরেকটি বার ছিটকে পড়তে চায়

বালিতে। আর একটি বার!

নতুন এক কণ্ঠের ডাকে তন্দ্রা কেটে গেল। চোখ মেলে দেখি ওসি রাজাপ্পা। বলছেন, মিস্টার চ্যাটার্জি! বাই চান্স ডিড ইউ সি দিস ম্যান?

রোদে তখনও করকর করছে চোখ। বললাম, হুইচ ম্যান?

ওসি একটা সেলোফেন ব্যাগ থেকে একটা কালো, মুশনো পাঞ্জা বার করে বললেন, দিস!

বাট দ্যাট ইজ ওনলি এ প'।

ইয়েস, এ ডার্টি ক্রিমিন্যাল ইজ মিসিং ফ্রম দ্য লোকাল প্রিজন। হ্যাজ লেফট বিহাইন্ড হিজ হ্যান্ড অন দ্য বিচ। উই ওয়ান্ট দ্য হোল ম্যান।

আমি বালির ওপর সোজা হয়ে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বিড়-বিড় করে প্রায় স্বগতোক্তির মত করে বললাম, নো, আই ডিড নট সি এ ম্যান উইদাউট এ হ্যান্ড। তারপর আরও অস্ফুট স্বরে শুধু নিজের শোনার মত করে বললাম, আই হ্যাভ সিন এ হোল ম্যান।

ওসি পাঞ্জাটা সেলোফেনের থলিতে ভরতে ভরতে বললেন, থ্যাংক ইউ। এঞ্জয় ইয়োরসেলফ। গুড বাই।

বলে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বালি ডিঙিয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন।

একটা নতুন ঢেউ এসে একটা চকচকে ছুরি ছুঁড়ে ফেলল বালিতে।

আমি তাকিয়ে দেখছি। শর্মিলা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে।

ভাবছি কলকাতা ফিরে জগুদাকে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখব। বাড়িতে নেমন্তন্ন করব।